লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুলাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে

নব পর্যায় ৭৩ বর্ষ | ১৮তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ চৈত্র, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ | ২৫ রবিঃ সানি, ১৪৩২ হিজরি | ৩১ আমান, ১৩৯০ হি. শা. | ৩১ মার্চ, ২০১১ ঈসাব্দ

SERVING MANKIND
Humanity First
CANADA

Humanity First

RESTORING COMMUNITIES · BUILDING A FUTURE

জাপানের দুর্গতদের পাশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবা সংগঠন 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট'

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

আল্লাহ্ তাআলা সতর্ককারী না পাঠিয়ে আযাব দেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কক্ষনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি; জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ন হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুনা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা সে জীবিত নয়, মৃত।"

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করন, পৃষ্ঠা: ২১৫)

সম্পাদকীয়

ভূমিকম্প-সুনামি সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

mPxc Î

১১ মার্চ ২০১১ জাপানে প্রলয়ঙ্করী যে ভূমিকম্প ও সুনামি সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে হয়তো সবাই কম বেশি অবগত। ভূমিকম্পের হাত থেকে রেহাই পায়নি জাপানের রাজধানী টোকিও। ভয়ংকর ভূমিকম্প ও সুনামিতে হাজার হাজার ভবন ধ্বংস হয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার এলাকায় মুছে গেছে মানববসতির চিহ্ন। প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামির আঘাতে ভেঙে পড়েছে দেশটির মেরুদণ্ড। প্রযুক্তির দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এই দেশ। তথাপি তাদের সেই প্রযুক্তি আজ কোনই কাজে আসছে না। যে জাপানিদের কাছে খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন অকল্পনীয় আজ তারাই বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাঁই নিচ্ছে। শুকনো দুটো রুটি আর নিরাপদ পানির জন্য আজ হাহাকার বিরাজ করছে যা সে দেশের সাধারণ মানুষও কখনো ভাবতে পারে নাই।

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সতর্ককারী এসেছে কিন্তু জগদ্বাসী তাঁকে গ্রহণ করে নাই। যার ফলেই সারা বিশ্বে একের পর এক দুর্যোগ ধেয়ে আসছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন–

মনে রেখ! খোদা তাআলা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চয় জেনো ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমেরিকায় যেমন ভূমিকম্প এসেছে, সেরূপ ইউরোপেও এসেছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায়ও আসবে। এদের মধ্যে অনেকগুলো কেয়ামত সদৃশ হবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হবে যে, রক্তের স্রোতধারা প্রবাহিত হবে। এ মৃত্যু হতে পশু পাখিও রক্ষা পাবেনা। পৃথিবীতে এমন ধ্বংস দেখা দেবে যে, মানব সৃষ্টি অবধি এমন ধ্বংস কখনও আসেনি এবং অধিকাংশ স্থান ওলট পালট হয়ে যাবে; দেখে মনে হবে যেন সেখানে কখনও কোন অধিবাসী ছিল না। এর সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হবে। এমনকি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে এসব অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। জ্যোতিষ ও দর্শনের পুস্তকে এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দেবে যে, পৃথিবীতে একি হতে চলেছে? অনেকে রক্ষা পাবে এবং অনেকে বিনষ্ট হবে। সেদিন সন্নিকটে এবং আমি তাকে (তোমাদের দ্বারপ্রান্তে) দেখতে পাচ্ছি। তখন দুনিয়া কিয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপূর্ব বিপদাবলী দেখা দেবে, কিছু আকাশ হতে এবং কিছু ভূতল হতে। এটি এজন্য হবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছেড়ে দিয়েছে এবং মন-প্রাণ ও শক্তি দিয়ে পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হয়েছে। আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত বাসনা প্রকাশিত হয়ে গেছে-যা এক দীর্ঘকাল যাবৎ অন্তরালে ছিল।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ- "এবং আমরা (সতর্ককারী) রাসূল না পাঠিয়ে আযাব অবতীর্ণ করি না।"

তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হবে তাদের প্রতি দয়া প্রর্দশন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কক্ষনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ-একথা মনে করোনা! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি; জনপদগুলোকে জনমানবশূণ্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। **নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে।** তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর ; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা সে জীবিত নয়, মৃত।" (হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২১৪-২১৫)

৩১ মার্চ ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
জুমুআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
হযরত উমর (রা.) মূল: মাশহুদ আহমদ এবং ফজল আহমদ ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ	১৭
শিখ ধর্মমত- কতিপয় বৈশিষ্ট্য মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	১৯
ডাকার মত ডাকলে আল্লাহ্ অবশ্যই সাড়া দেন সরফরাজ এম.এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২৩
'সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট'	২৫
পাঠক কলাম	২৯
সংবাদ	৩২
এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠান সূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤٠﴾

৪০। হে আমার দুই কারাসঙ্গী! (বল দেখি) ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রভু উত্তম, নাকি প্রবলপরাক্রান্ত এক আল্লাহ্ উত্তম?

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১। তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে কেবল এমনসব নামের উপাসনা কর যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা (কল্পিত উপাস্যদের) দিয়ে রেখেছ যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। এ হলো চিরস্থায়ী ও স্থিতিদানকারী ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।*

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ؕ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤٢﴾

৪২। হে আমার দুই কারাসঙ্গী! (তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো,) তোমাদের একজন তার মালিককে মদ পান করাবে। আর অন্যজনকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হবে এবং পাখি তার মাথা থেকে (ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে) খাবে। যে বিষয়ে তোমরা দু'জন আমার কাছে (ব্যাখ্যা) জানতে চেয়েছ এ (সম্পর্কে চূড়ান্ত) সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٣﴾ ع ١٥

৪৩। আর তাদের দু'জনের মাঝে যে মুক্তি পাবে বলে সে (অর্থাৎ ইউসুফ) মনে করেছিল তাকে সে বললো, তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা বলো।' কিন্তু শয়তান তার মালিককে (এ কথা) স্মরণ করাতে তাকে ভুলিয়ে দিল। সুতরাং কয়েক[১৩৮৩] বছর সে (অর্থাৎ ইউসুফ) কারাগারেই পড়ে রইল।

* [কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী 'ক্বায়িম' শব্দটি প্রবল শক্তিশালী প্রভৃতি গুণের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এ শব্দটি বিষয়াবলীর সহজ ও সরলীকরণের প্রতি ইঙ্গিতবাহী। অতএব সব ধর্মমতের অভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলোকে 'দীনুল ক্বায়িম' হিসেবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। একই শব্দের জন্য সূরা বাইয়্যেনাহ্ ৯৮:৬ দ্রষ্টব্য। (মওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

১৩৮৩। "বিয্‌উন" সংখ্যা বুঝায়, কিন্তু এর দ্বারা সাধারণত তিন থেকে নয় সংখ্যা বুঝায় (লেইন)।

হাদীস শরীফ

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতায় মহাকাশে প্রদর্শিত অবিস্মরণীয় নিদর্শন

কুরআন ঃ

এবং চন্দ্র সূর্য উভয়কে (গ্রহণে) একত্র করা হবে (সূরা ক্বিয়ামা : ১০)

হাদীস ঃ

আমাদের মাহদীর সত্যতার দু'টি নিদর্শন আছে। আর যখন থেকে খোদা তাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ দু'টি নিদর্শন কারও জন্য প্রদর্শন করেন নি। এর মধ্যে একটি এই যে, প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণের রাতগুলোর (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগবে। দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, এ রমযান মাসেই সূর্যগ্রহণের তারিখগুলোর (২৭, ২৮ ও ২৯) মাধ্যম তারিখে অর্থাৎ ২৮ তারিখে গ্রহণ লাগবে। (সুনানে দারকুতনী, বাবু সিফাতে সালাতিল খুসূফে ওয়াল কুসূফে ওয়া যাহায়াতেহিমা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮, মুদ্রাকর আনসারী ছাপাখানা, দিল্লী)

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী, হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রা.) নামে পরিচিত। তিনি হযরত ইমাম আলী যয়েনুল আবেদীন (রা.)-এর পুত্র এবং হযরত ইমাম হুসায়েন (রা.)-এর পৌত্র ছিলেন। হাদীসকে আল্লামা কুরতুবী তাযকিরাতে, আল্লামা জালাল উদ্দিন সাইউতী আল হাবী ও আল্লামা ইবনে হাজর হাশিমী আল্ কওলুল মুখতাসির এ বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতিরেকে কয়েকজন পূর্ববর্তী আলেমও বর্ণনা করেছেন। শিয়া পন্থী আলেমগণেরও এ হাদীস সম্বন্ধে ঐকমত্য রয়েছে (তফসীরে সাফী, প্রথম খন্ড, তেহরান, ফিতার ফোরশী ইসলামীয়া, পৃষ্ঠা-৭৬৫)।

হাদীসের শব্দে আওওয়ালে লায়লাতিন-এর অর্থ এটা হতে পারে না যে, রমযানের প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগবে। কেননা, প্রথম রাত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী গ্রহণ লাগতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ প্রথম রাত্রের চাঁদকে আরবীতে 'হেলাল' বলে। হাদীসে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'কমর' বলে (আল্ মুনজিদ নামক অভিধান দেখুন)।

১। চন্দ্র গ্রহণের নির্ধারিত তারিখগুলোর মধ্যে প্রথম রাত্রে অর্থাৎ ১৩ তারিখ রাত্রে গ্রহণ লাগবে।

২। সূর্য গ্রহণের নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে অর্থাৎ ২৮ তারিখ দিনে গ্রহণ লাগবে।

৩। উভয় গ্রহণই একই রমযান মাসে সংঘটিত হবে।

৪। একজন মাহ্‌দীর দাবীদারের উপস্থিতিতে তাঁর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ এ গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হবে। [বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ-ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর 'তোহ্‌ফা গোলড়াবিয়া' পুস্তকের ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

জ্যোতির্শাস্ত্র পাঠে এবং গ্রহণের তারিখগুলো দৃষ্টে জানা যায় যে, রমযান মাসে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির সময় থেকে নিয়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কখনও এসব নির্ধারিত তারিখে এ ধরনের সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় নি যাতে কোন দাবীকারক স্বীয় সত্যতার নিদর্শন হিসেবে এগুলোকে উপস্থাপন করেছেন।

এমন ঘটনা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই প্রথম সংঘটিত হয় যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম মাহ্‌দীর দাবীদার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আর সে সময় তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন মাহ্‌দীর দাবীদার পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন না। ১৮৯৪ সনের ২৩ মার্চ এ চন্দ্র গ্রহণের এবং ৬ এপ্রিল সূর্য গ্রহণের নিদর্শন পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে দেখানো হয় (আযাদ, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৪ এবং মিলিটারী গেজেট, ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪ দ্রষ্টব্য)। এসব শর্তানুযায়ী পরবর্তী বছরও রমযান মাসেই দ্বিতীয়বার চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় আর পশ্চিম গোলার্ধের লোকেরা সেই দৃশ্য অবলোকন করে।

খোদা তাআলা স্বীয় কর্মকান্ড দ্বারা সাক্ষ্য দিলেন ও নির্ধারিত দিনে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ দ্বারা প্রমাণ করলেন যে,

১। আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য এবং চৌদ্দশ' বছর পূর্বে একজন নিরক্ষর ব্যক্তি অদৃশ্যের এমন সংবাদ নিজের পক্ষ হতে তৈরী করে বলতে পারেন না। এটা মহানবী (সা.)-এর সত্যতারও একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

২। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় দাবীতে নিষ্ঠাবান ও প্রকৃতই সেই মাহ্‌দী যাঁর সম্বন্ধে হযরত রাসূল করীম (সা.) সংবাদ দিয়েছিলেন। কেননা, কোন মিথ্যা মাহ্‌দী সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগাতে পারে না। মহাকাশীয় বস্তুনিচয়ের ওপর ব্যক্তিবিশেষের কোন হাত নেই। (পুনঃ প্রকাশিত)।

মরহুম আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

অমৃতবাণী

মাহ্‌দী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামা'তের বিশ্বাস

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্বন্ধে আমার ও আমার জামা'তের বিশ্বাস এই যে, মাহ্‌দীর আগমন সংক্রান্ত এ ধরনের হাদীসসমূহ কোন মতেই আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার মতে এগুলোর উপর তিন ধরনের আপত্তি আছে। অন্য কথায় এগুলোর উপর তিন ধরনের আপত্তি আছে। অন্য কথায় এগুলি তিন শ্রেণীর বাইরে নয় ঃ (১) প্রথমত এসব হাদীস জাল, মওযূ (মনগড়া) অপ্রামাণ্য ও ভ্রান্ত এবং এদের বর্ণনাকারীদের উপর অবিশ্বস্ততা ও মিথ্যা বলার অপবাদ রয়েছে। কোন ধার্মিক মুসলমান এদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে না। (২) দ্বিতীয়তঃ এসব হাদীসে কিছু রয়েছে যেগুলো যয়ীফ (দুর্বল) ও মযরূহ্ (যে হাদীস বর্ণনাকারীর চরিত্রের উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়) হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে এগুলো আস্থার মানদন্ডে ধোপে টেকে না। হাদীসের বিখ্যাত ইমামগণ হয় এগুলোর উল্লেখ একবারেই করেন নি অথবা আপত্তি ও অবিশ্বাস বজায়ে রেখে উল্লেখ করেছেন। তারা এ রেওয়াতের সত্যায়ন করেন নি অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সততা ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেন নি। (৩) তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলোতে বিভিন্ন সনদে তাদের প্রামাণিকতার সন্ধান তো পাওয়া যায় কিন্তু এগুলো হয়তো পূর্বের যুগে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং ওগুলোতে বর্ণিত যুদ্ধগুলো বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গেছে। এখন সেগুলোর জন্য অপেক্ষার সম্ভাব্য কোন অবস্থা অবশিষ্ট নেই, অথবা এগুলোতে বাহ্যিক খিলাফত ও বাহ্যিক যুদ্ধের কোন উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র এক মাহ্‌দী অর্থাৎ এক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং ইঙ্গিতে বরং পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, তাঁর কোন বাহ্যিক রাজত্ব ও বাহ্যিক খিলাফত হবে না। সে না যুদ্ধ করবে আর না-ই রক্ত ঝরাবে। তাঁর কোন সৈন্যদল থাকবে না। বরং আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক দৃষ্টি দ্বারা হৃদয়গুলিতে আবারও ঈমান প্রতিষ্ঠিত করবেন।

যেমন কিনা হাদীসে আছে 'লা মাহ্‌দীয়্যা ইল্লা ঈসা"। এটা ইবনে মাজার প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে আছে এবং হাকীম প্রণীত হাদীস গ্রন্থ 'মুসতাদরেকে' আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা মুহাম্মদ বিন খালিদ জুন্দী আবান বিন সালেহ্ হাসান বসরী হতে, হাসান বাসরী আনাস বিন মালেক হতে এবং আনাস বিন মালেক জনাব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম হতে রেওয়ায়েত করেছেন। এই হাদীসের অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যিনি ঈসার প্রকৃতি ও চরিত্রে আগমন করবেন, অন্য কেউ মাহ্‌দী হবেন না। অর্থাৎ তিনিই প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী হবেন এবং তিনিই মাহ্‌দী হবেন, যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতি, চরিত্র ও তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে আগমন করবেন অর্থাৎ মন্দের মুকাবেলায় বল প্রয়োগ করবেন না ও যুদ্ধ করবেন না বরং পবিত্র আদর্শ ও ঐশী নিদর্শন দ্বারা হেদায়তকে বিস্তার দিবেন। এবং এই হাদীসের সমর্থনে আরেকটি হাদীস রয়েছে যা ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাতে এই কথা রয়েছে, **'ইয়াযাউল হারবা'** অর্থাৎ ঐ মাহ্‌দী যার নাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ তিনি ধর্মীয় যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে রহিত করে দিবেন। তাঁর এই নির্দেশ হবে যে, ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো না, বরং ধর্মকে সত্যের জ্যোতিঃ নৈতিক মু'জিযা ও খোদার নৈকট্যের নিদর্শনাবলী দ্বারা বিস্তার দাও। সুতরাং আমি সত্য সত্য বলছি, যে ব্যক্তি এ সময়ে খোদার ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছে অথবা যোদ্ধাদেরকে সমর্থন করে অথবা প্রকাশ্য বা গোপনে এরূপ পরামর্শ দেয় অথবা মনে মনে এমন ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে খোদা ও রাসূলের অবাধ্য এবং খোদা ও রাসূলের জরুরী বিধিবদ্ধ নির্দেশ-উপদেশ ও শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ এবং অবশ্যকরণীয় কর্তব্যসমূহের বাইরে চলে গেছে। আমি এখন আমাদের সদয় সরকারকে জানাচ্ছি যে, হেদায়াত প্রাপ্ত এবং মসীহ্ (আ.)-এর চরিত্রের উপর পরিচালিত সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ আমিই। প্রত্যেকের উচিত আমাকে ঐ সকল চারিত্রিক গুণাবলীর নিরিখে পরখ করে নেয়া এবং নিজ হৃদয় হতে মন্দ ধারণা দূর করা। আমার বিশ বছর ব্যাপী শিক্ষা , যা বারাহীনে আহমদীয়া হতে শুরু হয়ে 'রাযে হাকীকাত' পুস্তক প্রণয়ন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ এগুলোকে গভীরভাবে দেখে তবে ইহাকে আমার অভ্যন্তরীণ-পরিচ্ছন্নতার সব চাইতে বড় সাক্ষী হিসেবে পাবে। আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে যে, আমি এ গ্রন্থাবলী আরব, ইউরোপ, সিরিয়া, কাবুল ও অন্যন্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছি। আমি এ বিষয়কে নির্ঘাৎ অস্বীকার করি যে, ইসলামের পক্ষে ধর্মীয় যুদ্ধের জন্য মসীহ্ আকাশ হতে অবতরণ করবেন ও সে সময়ে ফাতেমার বংশধর হতে কোন ব্যক্তি মাহ্‌দী নামের বাদশাহ্ হবেন এবং দু'জনে মিলে রক্তপাত শুরু করবেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে সুনিশ্চিৎ জানিয়েছেন যে, এগুলো আদৌ সঠিক নয়। হযরত মসীহ্ (আ.) বহু পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কাশ্মীরের খানইয়ার মহল্লায় তাঁর মাজার (সমাধি) মজুদ আছে। সুতরাং যেভাবে মসীহ্ আকাশ হতে অবতীর্ণ হওয়া মিথ্যা প্রমাণিত সেভাবেই কোন যুদ্ধবাজ মাহ্‌দীর আগমন বাতিল সাব্যস্ত। এখন যে ব্যক্তি সত্য-পিপাসু সে যেন ইহা গ্রহণ করে।

('হাকীকাতুল মাহ্‌দী' বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৭-১০)

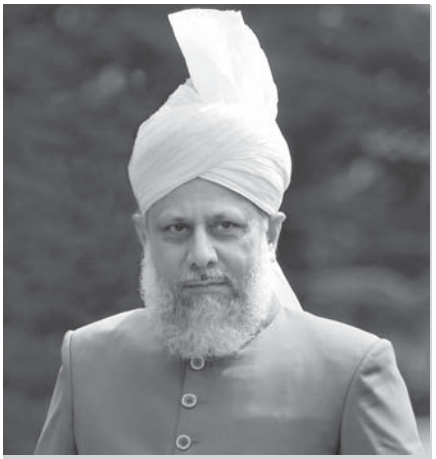

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২৮ জানুয়ারী, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

হযরত মহাম্মদ (সা.) সকল রাসূলের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কিয়ামত অবধি সমস্ত যুগের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে সেই মর্যাদা দান করেছেন যার প্রেক্ষিতে তাঁর অনুসরণে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা লাভ করে থাকে।

তাশাহুদ, তা'উয, তাসমিয়াহ এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর একটি হাদীসে কুদসী: **'লাউ লাকা লামা খালাকতুল আফলাক'**-এ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না- এ ভূমি এবং আকাশ সৃষ্টি করতাম না।

মুসলমানদের একটি বড় অংশ যদিও এ হাদীসের বিশুদ্ধতায় আপত্তি করে কিন্তু আমাদেরকে আঁ হযরত (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও যুগ ইমাম- এ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবগত করেছেন। এটি সেই মর্যাদা যা আঁ হযরত (সা.)-এর অতুলনীয় মর্যাদার দিকে ইংগিত করে। তিনি (সা.) সকল রাসূলের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কিয়ামত অবধি সমস্ত যুগের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে সেই মর্যাদা দান করেছেন যার প্রেক্ষিতে তাঁর অনুসরণে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা লাভ করে থাকে। তাঁকে (সা.) নবুওয়াতের সেই মোহর দান করা হয়েছে যা বিগত নবীগণকে মোহরাংকিত করে- সেই নবীগণের নবী হওয়াকে সত্যায়ন করে। তিনি সেই খাতামান্নাবীঈনের মর্যাদা লাভ করেছেন যার উম্মতিও নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করেছে, আর তাঁর উম্মাতি এবং নিষ্ঠবান প্রেমিক হওয়াই তাঁর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকরী মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)-কে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তাঁর (সা.) সাথে নৈকট্যকে খোদা তাআলা কুরআন করীমে এভাবে বর্ণনা করেছে **"দানা ফাতাদাল্লা"** এটি আল্লাহ্ তাআলার সাথে নৈকট্যের পরম উৎকর্ষতা। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন: "(এটি) আঁ হযরত (সা.)-এর মর্যদায় এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে, উপরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে মানব জাতির দিকে মনোনিবেশ করলেন। আঁ হযরত (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য অতি উচ্চ মার্গের বৈশিষ্ট্য, যার দৃষ্টান্ত অসম্ভব। আর এ বৈশিষ্ট্যে তাঁর দুটি পদমর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। একটি 'সউদ' (অর্থাৎ উচ্চতায় আরোহন করা) দ্বিতীয়টি 'নযূল'। আল্লাহ্ তাআলার দিকে তাঁর 'সউদ' হয়েছে অর্থাৎ খোদা তাআলার ভালবাসা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় এমন ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন যে, স্বয়ং সেই পবিত্র সত্বার 'দুনূ' এর মর্যাদা লাভ করেছেন। 'দুনূ' 'আকরাবু' থেকে ব্যপকতর (অর্থ বহন করে) এ কারণে এখানে এ শব্দ চয়ন করা হয়েছে। (অর্থাৎ 'দুনূ' 'কুরুব' এর তুলনায় ব্যাপক ও প্রসারতার অর্থ দেয়। 'কুরব' শব্দে কেবল নৈকট্যের ধারণা সৃষ্টি হয় কিন্তু 'দুনূ'-তে এতো নৈকট্যে যে, পরস্পর একই সত্ত্বায় রূপ নেয়। অত:পর তিনি (আ.) বলেন, যখন আল্লাহ্ তাআলার আশীষ ও কল্যাণসমূহ থেকে তিনি (সা.) অংশ লাভ করেন তখনই তিনি মানব জাতির জন্য নযূল করলেন। এটি সেই রহমত ছিল যা 'ওমা আর সালনাকা ইল্লা রাহ্মাতাল্লিল আলামীন' (সূরা আম্বিয়া:১০৮) এ উল্লেখ করা হয়েছে। (আমরা তোমাকে কেবলমাত্র রাহ্মাতাল্লিল

আলামীন করে প্রেরণ করেছি)। আঁ হযরত (সা.)-এর নাম 'কাসেম' হওয়ার এটিই গুঢ় তত্ব যে, তিনি আল্লাহ্ তাআলা থেকে গ্রহণ করে সৃষ্টির মাঝে বিতরণ করেন। সুতরাং সৃষ্টির নিকট বিতরনের জন্য তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, অতপর এই 'দানা ফাতাদাল্লাতে' এরূপ 'সউদ' এবং 'নযূল' এর দিকেই ইশারা করা হয়েছে। আর এটি আঁ হযরত (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদার দলিল। (মলফুযাত, চতুর্থ খন্ড পৃঃ ৩৫৬, রাবোয়া থেকে প্রকাশিত)।

সুতরাং তাঁর (সা.) 'নযূল' এর মাধ্যমে যে নতুন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে যাতে তিনি (সা.) আল্লাহ তাআলার নিকট সুউচ্চ নৈকট্য লাভ করে মানুষের মুক্তি, খোদা তাআলার সাথে ভালবাসা এবং আল্লাহ তাআলার সমীপে শাফায়াতের মর্যাদা লাভ করেছেন আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে 'রাহমাতাল্লিল আলামীন' মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর (সা.) সঙ্গে ভালবাসাকে নিজের সাথে (তথা খোদার সাথে) ভালবাসা আখ্যা দিয়েছেন। এ সকল বিষয়ে প্রমাণ করে যে, এ 'আফলাক' (আকাশসমূহ) ও খোদা তাআলার বিশেষ ভালবাসার প্রেক্ষিতে তাঁর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাঁর (সা.) উচ্চ মর্যাদার জন্য এ হাদীসে কুদসীকে আমাদের নির্ভূল মনে না করার কোন কারণ নেই। অতএব, এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভূক্তির মধ্যে দিয়েই আঁ হযরত (সা.)-এর মর্যাদাকে জেনেছি। এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **'লাউ লাকা লামা খালাকতুল আফলাক'** এ অসুবিধা কী? কুরআন মজীদে সাধারণ মানুষের জন্য **"খালাকালাকুম মা ফিল আরদি জামিয়া"** (বাকারাঃ ৩০) অর্থাৎ, ভূমিতে যা কিছু আছে সব কিছু সাধারণ মানুষের জন্য। তাহলে কী বিশেষ মানুষের জন্য এমন হতে পারে না যে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা 'আফলাক' আকাশ সমূহ? ..... (যদি পৃথিবীর সব কিছু সাধারণ মানুষের জন্য হতে পারে তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজ বিশেষ মানুষের জন্য 'আফলাক' এর সৃষ্টিও করতে পারেন)। তিনি বলেন, বস্তুত পক্ষে আদমকে যে খলীফা নির্বাচন করা হয়েছিল এর তাৎপর্য এটিই ছিল, তিনি এ সৃষ্টি সমূহ থেকে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ নিবেন। আর যে সকল বস্তুতে তার দখল নেই সেগুলো খোদা তাআলার নির্দেশে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে যেমনঃ সূর্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি।

অর্থাৎ যেগুলোতে মানুষের দখল নেই কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে এগুলো সব মানুষের সেবায় নিয়োজিত। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে এ জিনিসগুলো সর্বাপেক্ষা বেশি আঁ হযরত (সা.)-এর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অতীতেও করেছে আর এখনও করে যাচ্ছে। তাঁর (সা.) যুগে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এটি একটি আলৌকিক ঘটনা ছিল। পৃথিবীবাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। এটির বিস্তারিত বর্ণনা এখন উল্লেখ করবো না, কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ কথাই বলেছেন, আর প্রমাণ করেছেন যে, এ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

এক স্থানে এটিও বলেছেন, 'এটি হয়ত কোন্ ধরনের গ্রহণ হতে পারে যা অন্যরাও দেখেছে'। অতপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের মাহদীর জন্য যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অমুক মাসে, অমুক দিনে, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে (সুনন দার কুতনী, কিতাবুল ঈদাইন)।

এটিও আফলাক (বা আকাশের) বিষয়াদী, বিশ্ব জগতের এগুলিকে আনুগত্য করার বিষয়। আর সে যুগে যখন এ গ্রহণ হয়েছিল তখন সে যুগের সংবাদপত্র সমূহও এ বিষয়ের সাক্ষী যে, এ ঘটনা ঘটেছে।

যাহোক, এ সমস্ত ভূমিকা বা বর্ণনা থেকে আমার উদ্দেশ্য হল, তাঁর (সা.) সুউচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করা। এ ছাড়াও তাঁর (সা.) অগনিত অলৌকিক ঘটনা সমূহ আমরা রেওয়ায়াত সমূহের মাধ্যমে দেখতে পাই, যা দ্বারা তাঁর (সা.) মহান মর্যাদা এবং খোদা তাআলার সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারে অবগত হওয়া যায়, যার দৃষ্টান্ত পূর্বে কখনো পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ সকল বিষয়াবলী সত্ত্বেও কাফেরদের দাবীর প্রেক্ষিতে যা তারা করেছিল, আপনি আমাদের সামনে আকাশে আরোহন করেন আর এমন কেতাব নিয়ে আসেন, যা আমরা পাঠ করবো। তখন আল্লাহ্ তাআলা বললেন, **"কুল সুবহানা রাব্বি হাল কুনতু ইল্লা বাশারার রাসূলা"** (বনী ইসরাইলঃ ৯৪) অর্থাৎ তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার প্রভু প্রতিপালক এ সব বিষয়াদী থেকে পবিত্র, আমিতো কেবল একজন মানব রাসূল। সুতরাং তাঁর (সা.) মর্যাদা সকল মানুষের উর্ধ্বে কেননা তিনি পরিপূর্ণ মানব। কিন্তু মানব রাসূল হওয়ার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে খোদা তাআলা তাঁর সাথে সেই আচরণই করেছেন যেরূপ আচরণ তিনি অন্যান্য রাসূলদের সাথে করেছিলেন। অর্থাৎ যেভাবে অন্য রাসূলদের সাথে তাদের জাতিগুলো বিরোধীতা করেছে তাঁর (সা.) সাথেও করা হয়েছে। যেহেতু তিনি সকল যুগের জন্য এবং সমস্ত জাতির জন্য এসেছিলেন তাই সে যুগেও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বিরোধীতা করা হয়েছিল এখনও তা অব্যাহত আছে, আর এ বিরোধীতা করা হতে থাকবে। অন্যান্য নবীদের সাথেও হাসি ঠাট্টা হয়েছিল তাই তাঁর সাথেও হাসি ঠাট্টা হয়েছে আর হচ্ছে। কিন্তু পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ পূর্বেও নবীদের গ্রহণ করেছেন। তাঁকে তাঁর (সা.) যুগে সর্বাধিক গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁর জীবদ্দশায় আরবে আর আরবের বাইরে নিকট অঞ্চলগুলোতে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। অতঃপর একটি বিশ্ব দেখেছে যে, ইসলাম সমস্ত পৃথিবীতে ছেয়ে গেছে। আর আজও বিস্তার লাভ করে চলছে। এক সময় আসবে যখন পৃথিবীর অধিকাংশই ইসলাম ও আঁ হযরত (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত হবে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অধীনে তবলীগ এর দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **"বাল্লিগ মা উনযিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা"** (সূরা মায়দাঃ ৬৮)। অর্থাৎ তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যে কালাম অবতীর্ণ করা হয়েছে সেটিকে মানুষের নিকট পৌঁছে দাও। অতএব, তিনি (সা.) সৌন্দর্য, দয়া, ভালবাসা, ক্ষমা, ধৈর্য্য এবং দোয়া দ্বারা এ পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। অথচ অন্যান্যরা তো আঁ হযরত (সা.)-এর উপর এ আপত্তি দিয়ে থাকে, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু কতক মুসলমান আলেম বা নামধারী মুসলমান আলেমও এ দৃষ্টি ভঙ্গি রাখে যে, ইসলাম যুদ্ধের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। অথচ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত হয় অতঃপর পরবর্তী বছর যখন বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয় তারপর থেকে হুদায়বিয়া সন্ধি পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে যার মধ্যে আহযাবের যুদ্ধে সর্বাধিক

৩ হাজার সংখ্যায় মুসলমান অংশগ্রহণ করেছিল। হুদয়াবিয়া সন্ধির সময় ১৫ শত সদস্যের কাফেলা ছিল যারা তাঁর (সা.) সাথে মক্কায় গিয়েছিলেন আর হুদায়বিয়া সন্ধি পর্যন্ত এ সময়কাল প্রায় পাঁচ বৎসর ছিল। অথচ হুদায়বিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পৌনে দুই বৎসর সময়ে যে সৈন্যবাহিনী হুযূর (সা.)-এর সাথে মক্কা গিয়েছিল সেটির সংখ্যা ছিল ১০,০০০ (দশ হাজার)। সুতরাং এটিও একটি বড় দলিল যে, শান্তির দুই বৎসরে ইসলাম অধিক প্রসার লাভ করেছিল। এরূপে ভালবাসা ও শান্তির মাধ্যমে প্রচারের অনেক ঘটনা রয়েছে, ক্ষমার অনেক ঘটনা আছে, যা মানুষের হৃদয়কে জয় করেছে।

আঁ হযরত (সা.)-এর ক্ষমা, মার্জনা, স্নেহের ব্যবহারের ঘটনা আমি বিগত খুতবা সমূহেও বর্ণনা করেছি। তিনি (সা.) এ সকল ব্যবহার কেন করেছিলেন? এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এটি তোমাকে করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা এ কথা বলেছেন, নি:সন্দেহে এ আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত, তথাপি নবীদের সাথে মানুষের আচরণের যে ধারা চলে আসছে তা তাঁর (সা.) সাথেও সংঘটিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলেন, "হে নবী! তোমার সাথেও হবে, কিন্তু তুমি ধৈর্য সংযম, সহ্য ক্ষমা, সহিষ্ণুতার মাধ্যমে তবলীগের কাজ করে যাবে। পারতপক্ষে কাঠিন্য প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবে কেবল এটি ব্যতিরেকে যে, যদি কোন যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রত্যেক প্রকারের মন্দ, অশ্লীলতা, দুঃখ, কষ্টে ধৈর্য্যের উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে থাকবে। ইসলামের শান্তি ও ভালবাসার বার্তা এভাবেই ছড়াবে। কুরআন করীমে খোদা তাআলা কিভাবে এ সকল বিষয়াবলী বর্ণনা করেছেন আর কিরূপ উপদেশ প্রদান করেছেন? আমি সেগুলি বর্ণনা করছি।

আল্লাহ তাআলা সূরা কাহাফে বলেন,

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ

অর্থাৎ, তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং স্বীয় প্রভূর গুণ কীর্ত্তনসহ, সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্য অস্তয়ের পূর্বে প্রশংসা করতে থাকো। (সূরা ক্বাফ: ৪০)

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা তাকে সান্তনা দিয়েছেন যে, শত্রু যে কটুক্তি ও কষ্টদায়ক আচরণ করে সেটিতো হওয়ারই ছিল, তুমি ধৈর্য্যের সাথে সহ্য কর। কুরআন করীম এ সব ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ যে, আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রাসূলই বিজয়ী হবেন। যার সাথে খোদা তাআলা আছেন সেই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে থাকে। এ কারনে আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি কুরআন করীম এবং এর শিক্ষার মাধ্যমে উপদেশ দাও ও সতর্ক করতে থাক। সুতরাং যারা খোদাকে ভয় করে তারা এ উপদেশ ও সতর্কতার কারণে ভীত হয়ে নিজের ইহকাল এবং শেষ পরিণামের সফল সম্পন্নকারী হয়ে যাবে।

অত:পর খোদা তাআলা আঁ হযরত (সা.)-কে শত্রুদের রূঢ় আচরণের প্রেক্ষিতে কি আচরণ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন? আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۭ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেরূপ দৃঢ় সংকল্পকারী রাসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং তাদের সম্পর্কে তাড়াহুড়া করো না। যেদিন তারা সেটিকে দেখবে যার সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তখন তাদের নিকট এমন মনে হবে, যেন তারা দিনের একটি অংশের বেশি অপেক্ষারত ছিল না। সংবাদ পৌঁছানো হয়েছে। সুতরাং দুস্কৃতিপরায়ণ ছাড়া আর কাউকেও কি ধ্বংস করা হয়ে থাকে?

(সূরা আহকাফ: ৩৬)

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তাঁর (সা.) আগমনের মাধ্যমে যে নতুন ব্যবস্থাপনা জারী হবার ছিল, সেটি জারী হয়ে গেছে, সেটি খোদা তাআলার তাকদীর। তবে সফলতা লাভেরও একটি সময় রয়েছে। তাই সহ্য ও ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ করা উচিত। হে রাসূল (সা.)! আপনি এবং আপনার মান্যকারীগণকেও এরূপ সহ্য ও ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ করতে হবে এটিই দৃঢ় সংকল্পকারী নবীগণ এবং তাদের মান্যকারীদের পদ্ধতি। সহ্য ও ধৈর্যেই এ সকল কষ্ট এবং কাঠিন্যে সফলতার কারণ হয়ে থাকে। যখন সফলতা আসবে শত্রু ধৃত হবে, তখন সে চিন্তা করবে, আমি কি করছিলাম। তখন তার খেয়াল হবে, বৈষয়িক জীবন যাকে আমি সব কিছু মনে করছিলাম সেটিতো কেবল দিনের একটি অংশ অথবা এক ঘন্টার চেয়ে অধিক কিছুই ছিল না। অতএব নবীগণের বিরোদ্ধাচরণকারীদেরকে ধৃত করার যতটুকু সম্পর্ক আছে এ কাজ আল্লাহ্ তাআলা নিজ হস্তে রেখেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আঁ হযরত (সা.)-এর সাথেও এ আচরণ সবচেয়ে বেশি প্রদর্শন করেছেন।

তাঁর শত্রুদেরকে এমনভাবে পর্যদুস্ত এবং পদদলীত করেছেন যে, তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর (সা.) বড় বড় শত্রু যাদেরকে মক্কার সর্দার মনে করা হত তারা কোথায় গেল? কোথায় গেল সে বাদশাহ যে তাঁকে ধরার জন্য সেনা পাঠিয়েছিল? তাই আঁ হযরত (সা.)-এর যুগ যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত সেজন্য খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রত্যেক যুগে শত্রুদের ধৃত হওয়ার নিদর্শনও প্রদর্শিত হতে থাকবে।

আঁ হযরত (সা.)-এর বিরোদ্ধবাদীগণ তাঁকে কিভাবে কষ্ট দিত, তাঁর (সা.) কী কী নাম রেখে ছিল আর কিভাবে তাঁকে বদনাম করার চেষ্টা করেছে, সে সম্পর্কে কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বলেন,

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝

অর্থাৎ, এবং তারা বলে, হে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে নিশ্চয় তুমি পাগল।

(সূরা হিজর: ৭)

এটি আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি বিদ্রুপ বরং প্রকাশ্য একটি গালি। এ সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল আর তখন কেবল কয়েকজন ইমান আনয়নকারী পবিত্রচেতা ব্যক্তি ব্যতিরেকে সেখানকার প্রায় সমস্ত জনবসতিই তাঁর সাথে এরূপ আচরণ করতো। কিন্তু যখন তিনি (সা.) মক্কা বিজয় করেন তখন সকলের সাথে ভালবাসা এবং নম্রতার আচরণ প্রদর্শন করেছেন। বরং যেভাবে আমি বিগত খুতবায় বলেছি, এ

সকল লোক কেবল গালমন্দকারীই ছিল না, এসকল লোক নির্যাতনকে চরমত্ত দান করেছিল। বলপূর্বক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রত্যেকের সাথে নম্র আচরণ করেছেন। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন যে, আমি নিজে প্রতিশোধ নিব।

অতপর আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে সূরা ফুরকানে বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ۝

অর্থাৎ আর যে সকল লোক অস্বীকার করেছে তারা বলে, এটি মিথ্যা ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়, যা সে বানিয়ে নিয়েছে। আর এ ব্যাপারে অন্য লোকেরা তাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং নিশ্চয় তারা প্রকাশ্য অত্যচারী ও মিথ্যা আরোপকারী। (ফুরকান: ৫) যদিও এ আয়াতে ব্যাপক বিষয় বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এখানে কেবল এটি বলাই উদ্দেশ্য যে, তাঁর (সা.) দাবীর পূর্বে যারা তাঁকে সত্যবাদী আখ্যা দিত আর এতে তাদের মুখ ক্লান্ত হত না, তাঁর সত্যবাদীতা ও বিশ্বস্ততার মান্যকারী ছিল।

অত:পর হুযূর (সা.)-এর সাথে অত্যচারকারীদের কটুক্তির ব্যাপারে কুরআন করীমে এভাবে বর্ণনা এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, **"ওয়া কালায্ যালিমুনা আন্ তাত্তাবিয়ু ইল্লা রাজুলান মাস্হুরা"** এ আয়াতের অর্থ হল, আর অত্যাচারীরা বলে, তোমরা এমন এক ব্যক্তির পিছনে চলছো যাকে জাদু করা হয়েছে।

(ফুরকান: ৯)

অত:পর কাফেরদের মন্দ বাক্যালাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা অন্য এক আয়াতে বলেন,

আর তাদের কাছে তাদেরই মাঝ থেকে একজন সতর্ককারী আসায় তারা অবাক হলো। আর কাফিররা বললো, এ একজন যাদুকর ও বড় মিথ্যাবাদী।

(সূরা সাদ: ৫)।

সুতরাং কখনো মিথ্যাবাদী, কখনো জাদুকর বা অন্য কিছু কিংবা কখনো অন্য কোন নামে কাফেররা তাঁকে (সা.) ডাকতে থাকে। আর তার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলতে থাকে, বিভিন্নভাবে তারা তাঁর সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে তথাপি আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ধৈর্য, প্রশংসা ও দোয়ার নির্দেশ দেন, আর মু'মিনদেরকেও আল্লাহ্ তাআলা একই নির্দেশ দিয়েছেন।

অতপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۫ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

অর্থাৎ আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং যারা শির্ক করেছে তাদের পক্ষ থেকেও তোমরা নিশ্চয় অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে নিশ্চয় তা হবে সাহসিকতার কাজ।

[আলে ইমরান:১৮৭]

অতএব এমন একজন মু'মিন ব্যক্তি যে নিজের প্রেমাস্পদ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য ভালবাসা রাখে, নিজ প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় জ্ঞান করে, তার জন্য এর চেয়ে বেশি হৃদয়বিদারক ও কষ্টকর বিষয় আর কি হতে পারে যে, সে নিজের নেতা সম্পর্কে এমন কোন বিষয় শুনবে যা তাঁর (সা.) মর্যাদায় সামান্যতম আঘাত আনতে পারে। কোন রাসূল প্রেমিকই কোন অবস্থাতেই এটি সহ্য করতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এখানে বলেন, তোমরা এমন কথা শুনেও ধৈর্য ধারণ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, গত খুতবায় আমি সেটির উদাহরণ দিয়েছিলাম, প্রকৃত প্রতিক্রিয়া সেটিই যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রদর্শন করেছিলেন কিন্তু এর জন্যও তাকওয়ার শর্ত রয়েছে। তাকওয়া অবলম্বন করে নিজের আমল এবং দোয়ার মাধ্যমে যে জবাব দিবে সেটিই ঐ ভালবাসার সঠিক প্রকাশ হবে। আমরা শত্রুদের গালমন্দ শুনে তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে দোয়ার সাহায্যে প্রতিশোধ গ্রহণকারী খোদার সম্মুখে অবনত হলেই ইসলামের শত্রুদের মন্দ পরিণতি অবলোকন করতে পারব। তবে আমাদের নিজেদের তাকওয়ার শর্ত আবশ্যক। যাহোক, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর (সা.) এবং কুরআনের প্রতি আপত্তিকারীদের প্রতি উত্তরে কুরআনে যা বলেছেন তা এটিই যে, এ ব্যাপারে খোদা তাআলা স্বয়ং প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা শত্রুদের কুরআন করীমের এক জায়গায় যে উত্তর দিয়েছেন সেটি সূরা আল্ হাক্কায় (আল্লাহ্) বলেন,

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝
وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۝
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝
تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

অর্থাৎ নিশ্চয় এ (কুরআন) এক সম্মানিত রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী। আর এটি কোন কবির কথা নয়। তোমরা অল্পই ঈমান এনে থাক। আর এটি কোন গণকেরও কথা নয় তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। এটি তো বিশ্ব জগতের প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

(সূরা হাক্কা ৪১-৪৪)

নাউযুবিল্লাহ! ঐ সকল হাসি ঠাট্টাকারী, যারা তাঁকে (সা.) বিভিন্ন নামে সম্বোধনকারী, মিথ্যা আরোপকারী তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা এ উত্তর দিয়েছেন। সুতরাং এটি হল, তাঁর সাথে হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের এবং আপত্তিকারীদের যথাযথ উত্তর।

এগুলো সত্ত্বেও খোদা তাআলা মু'মিনগণ এবং তিনি (সা.)-কে ধৈর্য ও দোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, খোদা তাআলা নিজে শত্রুদের ছেড়ে দেননি। তিনি কেবল এ উত্তর দেন নি যে, তোমাদের আপত্তি সমূহ যা তোমরা তাঁর প্রতি আরোপ করছো সে গণক, সে মিথ্যাবাদী, তোমাদের এ আপত্তি যথার্থ নয় বরং আল্লাহ্ তাআলা যখন এটি বলেন যে, **"ইন্না কাফফাইনাকাল মুসতাহ্যিইয়ীন"** অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা হাসি-ঠাট্টাকারীদের মোকাবেলায় তোমার জন্য যথেষ্ট।

(সূরা হিজর: ৯৬)।

আল্লাহ্ ইসলামের শত্রুদের থেকে এ পৃথিবীতেই প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন বা মৃত্যুর পর। খোদা তাআলা বলেন,

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۱﴾

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۲﴾

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿۲۳﴾

অর্থাৎ আর যারা দুষ্কর্ম করেছে তাদের ঠাই হবে আগুন। তারা যখনই তা থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাতে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, এখন তোমরা সেই আগুনের আযাব ভোগ কর, যা তোমরা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে। আর আমরা নিশ্চয়ই (বড় আযাবের পূর্বে তাদের ছোট আযাবের) স্বাদ গ্রহণ করাবো যাতে তারা (অনুতাপের সাথে আমাদের দিকে) ফিরে আসে।

আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রভু-প্রতিপালকের আয়াত সমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পরও, সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিব।

(সূরা আস্ সেজদা: ২১-২৩)

সুতরাং শত্রু যদি শত্রুতা থেকে বিরত না হয়তাহলে আল্লাহ্ তাআলা যিনি তাঁর স্নেহাস্পদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন তিনি শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া ব্যতিরেকে ছাড়েন না।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সংশোধনের জন্য

নিজের কতক নিদর্শন প্রদর্শন করেন, শত্রুরা যদি আল্লাহ্ তাআলার সতর্কতাসমূহ থেকে উপকৃত না হয়, সেই উপদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়েন না তাহলে অবশ্যই শাস্তি দিয়ে থাকেন। তবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এ ক্ষমতা আমার নিকটেই আছে।

অত:পর তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে খোদা তাআলা বলেন,

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿۱۱﴾

وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿۱۲﴾

اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿۱۳﴾

وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۴﴾

অর্থাৎ আর তারা যা বলে এতে ধৈর্য ধর এবং তাদের কাছ থেকে ভদ্রভাবে সরে পড়. আর তুমি আমাকে ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী প্রত্যাখানকারীদের (একা) ছেড়ে দাও এবং এদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও; নিশ্চয় আমাদের কাছে রয়েছে শাস্তির অনেক উপকরণ ও জাহান্নাম, এবং গলায় আটকে যাওয়া এক খাবার আর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিও (রয়েছে)।

(মুযাম্মিল: ১১-১৪)।

সুতরাং যেখানে তাঁকে (সা.) ধৈর্যের নির্দেশ দয়া হয়েছে, সেখানে বৈষয়িক লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পার্থিব সুখ সাচ্ছন্দ্য তাদেরকে অস্বীকারকারী বানিয়ে দিয়েছে এ অস্বীকারের শাস্তি তারা পাবে কেননা তারা সীমালংঘন করে যাচ্ছে। তাদের শাস্তিও এরূপ হবে যা অন্যদের জন্য লাঞ্চনার নিদর্শন হবে। আর এ লাঞ্চনার নিদর্শন বানানোর বিষয়টিও খোদা তাআলা নিজের কাছে রেখেছেন।

নবী এবং তাঁর মান্যকারীদের ধৈর্য ধারণ করার, আর অস্বীকারকারীদের বৃথা বাক্যালাপ শুনে ঝগড়া না করে তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

অত:পর খোদা তাআলা স্বয়ং শাস্তি দেয়ার বর্ণনা সূরা আলাক্বে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ﴿۱۰﴾ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ﴿۱۱﴾

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰۤى ﴿۱۲﴾

اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ﴿۱۳﴾

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿۱۴﴾

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿۱۵﴾

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا

بِالنَّاصِيَةِ ﴿۱۶﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿۱۷﴾

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿۱۸﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿۱۹﴾

অর্থাৎ তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ যে বাধা দেয়, এক মহান বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে? সাবধান! সে হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও অথবা সে তাকওয়ার নির্দেশ দিলেও কি তাকে বাধা দিবে? সে ব্যক্তি যদি সত্যকে প্রত্যাখান করে এবং মুখ ফিরিয়ে রাখে (সেক্ষেত্রে) তুমি কি ভেবে দেখেছ তার পরিণতি কি হবে? আল্লাহ্ যে দেখছেন তা কি সে অনুধাবন করে না? সাবধান! সে বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তার কপালের ঝুটি ধরে টানবো। তা হলো এক মিথ্যা ও পপিষ্ঠ কপালের ঝুঁটি। এরপর সে (অর্থাৎ কাফির) তার ঘনিষ্ঠ সাঙ্গপাঙ্গকে ডেকে আনুক। এবং আমরাও (আমাদের) শাস্তির ফিরিশতাদের ডেকে আনবো যারা তাকে জাহান্নাম নিক্ষেপ করবে।

(সূরা আলাক্ব: ১০-১৯)

সুতরাং এটি হল খোদা তাআলার শাস্তি দেয়ার পদ্ধতি। আজ এ বিষয়টি চিন্তা করা উচিত, সেই মহান ব্যক্তির অনুসরণে যে সকল মানুষ নামায পড়ে, আর যারা তাদেরকে নামায পড়তে বাঁধা দেয়, তারা কারা? সুতরাং এটি তাদের জন্যও অত্যন্ত ভয়ের বিষয়, যারা কাউকে ইবাদত করতে বাঁধা দেয়।

আল্লাহ্ তাআলা যখন তার প্রিয় নবীর জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর সঙ্গে হাসি ঠাট্টাকারী আর অস্বীকারে অগ্রসরমান এবং কষ্টদানকারীদের অভিসম্পাত দিতে গিয়ে বলেন,

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّۢا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۷﴾

এটি সূরা নিসার ৪৭ নং আয়াত (তিনি আল্লাহ্) বলেন, যারা ইহুদী হয়েছে তাদের এক শ্রেণী আল্লাহ্র বাণীকে যথাস্থান থেকে বিচ্যুত করে। আর তারা বলে, আমরা

শুনলাম ও অমান্য করলাম। আর তারা আরো বলে, তুমি আমাদের কথাই শুন, অন্য কারো কথা যেন তোমাকে শুনানো না হয়।

আর তারা তাদের জিহ্বাকে মোচড় দিয়ে এবং ধর্মে খোঁচা দিয়ে 'রায়েনা' বলে। আর তারা যদি বলতো, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম এবং আরো বলতো তুমি শুন এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দাও তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য উত্তম ও অধিক সঙ্গত হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অস্বীকারের দরুন তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। অতএব তারা ঈমান আনে না বললেই চলে।

(নিসা: ৪৭)

সুতরাং যারা রাসূল (সা.)-এর অবমাননার রাস্তা অবলম্বন করবে তারা এ অভিশম্পাতে পতিত হবে। অত:পর ইহুদীদের এ কথা বলা আমরা এ রাসূলের সাথে এতো কিছু করছি অর্থাৎ যে কষ্ট তাকে দেয়া সম্ভব, যে গালমন্দ করা সম্ভব তার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র সম্ভব সব করছি, এ রাসূল যদি সত্য হত তাহলে আল্লাহ্ তাআলা কেন আমাদের শাস্তি দেন না? আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۖ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ۙ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

অর্থাৎ তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? কিন্তু তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা এরই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। আর তারা পাপ, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতা করার ব্যাপারে পরস্পর গোপন পরামর্শ করে। আর তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা তোমাকে এভাবে সালাম করে যেভাবে আল্লাহ্ তোমার ওপর সালাম পাঠান নি। আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি এর জন্য আল্লাহ্ আমাদের কেন আযাব দেন না? তাদের শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তারা এতে প্রবেশ করবে। আর তা কতই মন্দ বাসস্থান।

(মুজাদেলা:৯)

কতক হাদীস থেকেও প্রমাণিত, এ ইহুদীগণ অনেক সময় এমনিই আঁ হযরত (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করত অথবা তাঁর মজলিসে আগমন করতো তখন তারা 'আসসালামু আলাইকুম' এর পরিবর্তে 'আসসামু আলাইকা' বলে, নাউযুবিল্লাহ্! তাঁর মৃত্যুর আকাংখা করতো। আমি যেভাবে বিগত খুতবা সমূহেও হাদীস বর্ণনা করেছি, এতে কতক সময় সাহাবারা বলতেন, আমরা একে হত্যা করবো। তখন তিনি (সা.) তাদেরকে বাধা দিতেন।

(বুখারী, কিতাব ইসতাত্‌বাতুল মুরতাদ্‌দীনা ওয়াল মুয়ানেদীন, হাদীস নং ৬৯২৬)।

এ কারণে যে, তাদের এই বৃথা কার্যকলাপের (শাস্তির) বিষয় খোদা তাআলা স্বয়ং নিজের হস্তে রেখেছেন। খোদা তাআলা তাদেরকে জাহান্নামে নিপতিত করে যে শাস্তি দিবেন তা এ দুনিয়াবী শাস্তির ন্যায় হতে পারে না। তাই যেভাবে আমি পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি, তিনি (সা.) খোদা তাআলার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র, কিয়ামত অবধি তাঁর নবুওয়াতের ধারা প্রবাহমান, তিনি সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য সকল রাসূলগণের ন্যায় তাকেও ধর্মের শত্রুদের বিরোধীতা এবং প্রত্যেক ধরনের ক্ষতির পরিকল্পনার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রত্যেক বার আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ কথা বলেছেন, দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী নবীগণের ন্যায় ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কাজ কর। তাঁর অনুসারীদেরকেও এরূপ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেন, ধর্মের শত্রুদের হাসি ঠাট্টা, নিরর্থক কথাবার্তা, আর মন্দকর্মের প্রতিশোধ আমি কিভাবে গ্রহণ করবো, তাদের মধ্য থেকে কতককে এ পৃথিবীতে এবং কতককে মৃত্যুর পর জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে। তবে যদি শত্রু যুদ্ধ করে আর জাতির শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস করে তবে তাদের মোকাবেলার অনুমতি আছে।

কেননা যদি এ মোকাবেলার অনুমতি না দেয়া হয় তবে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারীরা প্রত্যেক ধর্মের অনুসরণকারীদের সুখ শান্তিকে বিনষ্ট করে দিবে।

খোদা তাআলা এ পৃথিবীতে কিভাবে তাঁর (সা.) অবমাননাকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন সেটিরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একটি প্রতিশোধের ঘোষণা কুরআন করীম এভাবে উল্লেখ করেছে, 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিওঁ ওয়াতাব' অর্থাৎ আবু লাহাবের দুটো হাত ধ্বংস হোক এবং সেও ধংস হোক।

(সূরা লাহাব: ২)

তিনি (সা.) যখন নবুওয়াতের দাবী করলেন আর নিজের আত্মীয় স্বজনদের তবলীগের জন্য একত্রিত করলেন তখন এ ব্যক্তি (আবু লাহাব) যিনি তাঁর (সা.) চাচা ছিলেন, তাঁর (সা.) সর্ম্পকে নিতান্তই অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছিল।

(বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাব সূরা তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিওঁ, হাদীস নং ৪৯৭১)।

দেখ! তখন সত্য প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী সর্বশক্তিমান খোদা তাকে কিভাবে ধৃত করেছিলেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, একদা এক সফরে নেকড়ের দল তাকে আক্রমণ করে বসে আর তাকে খন্ড বিখন্ড করে ফেলে।

অতএব তিনি (সা.), যাকে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত প্রেমাস্পদ ও শ্রেষ্ঠতর করে রেখেছেন, তাঁর সঙ্গে খোদা তাআলার কৃত প্রতিশ্রুতিসমূহও সর্বদা পূর্ণ হতে থাকবে। প্রত্যেক যুগেই ইসলামের শত্রুরা নিজেদের পরিণাম ভোগ করবে এবং করতে থাকবে।

আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা আমাদেরকে তাঁর (সা.) সুউচ্চ মর্যাদার দৃশ্য দেখাতে থাকুন এবং তার সাথে খোদা তাআলার ভালবাসার আচরণ প্রদর্শন করতে থাকুন।

আমরা যেন প্রকৃত অর্থে কুরআনের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্ত-বায়নকারী এবং আঁ হযরত (সা.) স্বীয় উম্মতের কাছে যেরূপ প্রত্যাশা করেছেন ঠিক সেরূপ মু'মিন হওয়ার চেষ্টা করি।

অনুবাদ : **মওলানা বশিরুর রহমান**
মুরুব্বী সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

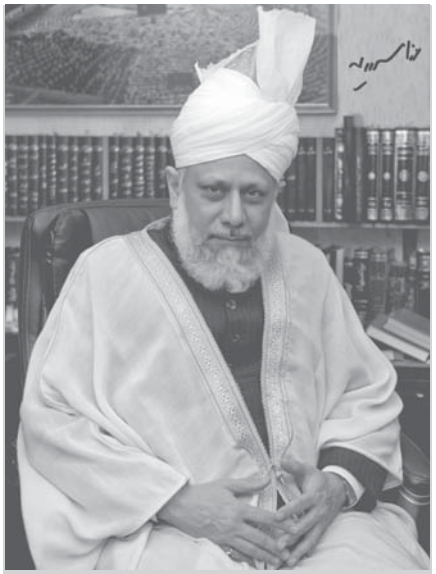

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৪ জানুয়ারী, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহ্হুদ, তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থাৎ 'তুমি মার্জনার পথ অবলম্বন কর এবং সঙ্গত কাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল।'

(সূরা আল্ আ'রাফ-২০০)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে -

كان خلقه القرآن

অর্থাৎ 'তাঁর জীবন কুরআন করীমের বিধি-বিধান ও নৈতিকতার মূর্তিমান দৃষ্টান্ত।'

হযরত আয়শা (রা.)-এর এ উক্তিটি নবী করীম (সা.)-এর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অসীম সমুদ্রের প্রতি দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলছে, যাও! এ সমুদ্র থেকে মূল্যবান মণিমাণিক্য অন্বেষণ কর। মহান চারিত্রিক গুণাবলীর যে কোন মাণিক্যই অন্বেষণ কর না কেন তাতে তোমরা আমার প্রিয় প্রভূ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর মোহর অঙ্কিত পাবে।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম।

(সূরা আল মায়েদা-৪)।

আল্লাহ্ তাআলার এ বাণীতে খতমে নবুওয়াতের বিশেষ মর্যাদার বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব, নবী করীম (সা.)-এর প্রতি শেষ শরীয়ত অবতীর্ণ করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা ধর্ম ও নেয়ামত (বা পুরস্কারের) পূর্ণতা দান করেছেন। কাজেই এই ইলহামী গ্রন্থ ও নিজ প্রভূ-প্রতিপালকের অভিপ্রায় সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান তিনি (সা.) ব্যতীত আর কার থাকতে পারে? মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি আঙ্গিক একদিকে কুরআন করীমের ব্যবহারিক প্রতিরূপ এবং অন্যদিকে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী আমাদের জন্য সর্বোত্তম জীবনাদর্শ।

এখন আমি আপনাদের সম্মুখে নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর সুন্দরতম একটি দিকের এমন কিছু বিষয় তুলে ধরবো যা সৎ প্রকৃতির মানুষকে তাঁর ভালবাসায় আরো বেশি নিমগ্ন করে। এবং মুনাফিকদের নোংরামীকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার মাধ্যমে তিনি (সা.) যখন স্বীয় চারিত্রিক গুণাবলী উপস্থাপন করেছেন তখন বিশ্ববাসীর কাছে তাদের (অর্থাৎ মুনাফেকদের) চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। আমি যে মহান চারিত্রিক গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাচ্ছি তা হল, মার্জনা করা।

অপরাধী ধরা পড়ার পরও তাকে শাস্তির পরিবর্তে হযরত রাসূল করীম (সা.) ভালবাসার তীর দিয়ে এমন ভাবে ঘায়েল করতেন যে, সে তাঁর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। এমন কি কেউ আছে যে এই অনুগ্রহ ও মার্জনার মোকাবেলা করতে পারে?

আল্লাহ্ তাআলার এ আদেশ সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 'মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জীবনাদর্শ'। কাজেই বর্তমান যুগের মুসলমানদেরও সেই আদর্শের অনুসরণের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। হায়! যদি তারা বুঝত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

'আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য প্রাপ্তদের অনেক গাল-মন্দ করা হয়েছে। অত্যন্ত বর্বরোচিত ভাবে কষ্ট দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থাৎ অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল (সূরা আল্ আ'রাফ-২০০)।

আমাদের নবী ও পূর্ণতম মানব (সা.) কেও জঘন্য পন্থায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, গালাগালি করা হয়েছে, কটূকথা শোনানো হয়েছে এবং উত্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী সত্তা এর বিপরীতে কী করেছেন? কেননা আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গিকার করেছেন, তুমি যদি জাহেলদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ তবে তোমার সম্মানকে সমুন্নত রাখব এবং তোমার প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করব। দুষ্ট মানুষেরা তোমার চরিত্রের উপর আক্রমণ করতে পারবে না।

বাস্তবেও তেমনই ঘটেছে। বিরোধীরা নবী করীম (সা.)-এর সম্মানে আঁচড়ও কাটতে পারে নি। বরং লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়ে তারা নবী করীম (সা.)-এর পদতলে ধরাশায়ী হয়েছে অথবা তাঁর (সা.) সম্মুখে নতজানু হয়েছে।'

(রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭ইং, পৃষ্ঠা ৯৯)

বলা সহজ হলেও বাস্তবে নিজের এবং নিজের সাহাবাদের উপর ধারাবাহিক ভাবে নিপীড়ন ও নির্যাতন হতে দেখা এবং পরবর্তীতে পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মার্জনা করার এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

এটা নবী করীম (সা.)-এরই বিশেষ কৃতিত্ব। মুনাফেক ও অপ্রশিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তিনি প্রদর্শণ করেছেন সেটা কোন সাধারণ বিষয় নয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে যে কোন ইতিহাসবিদ ধর্মীয় মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলতে বাধ্য, তিনি (সা.) যে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও অন্য প্রতিটি নৈতিক গুণাবলীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন তা অতুলনীয়। আর কোন কোন হিন্দু ও খ্রীস্টান লেখক এ কথা লিখেছেনও।

এখন আমি এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করছি যা মহানবী (সা.)-এর মার্জনা করার মহান গুণের প্রতি আলোকপাত করে। প্রথমে আমি মুনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের ঘটনা বর্ণনা করছি। সে বাহ্যিক ভাবে নবী করীম (সা.)-এর আনুগত্য মেনে নিলেও মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তি সত্তার উপর বর্বরোচিত আক্রমণের ক্ষেত্রে কোন সুযোগ হাত ছাড়া করে নি। মদীনায় থাকা অবস্থায় অনবরতই এমন হতো।

নবী করীম (সা.) মদীনায় হিযরতের পূর্বে মদীনাবাসী তাকে তাদের নেতা বনানোর কথা ভাবছিল, এটাই ছিল তার শত্রুতার মূল কারণ। কিন্তু তিনি (সা.)-এর আগমনের পর মদীনার প্রতিটি গোত্র ও ধর্মের লোকেরা যখন মহানবী (সা.)-কে প্রশাসনিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করল তখন এ ব্যক্তি বাহ্যিক ভাবে বিরোধিতা না করলেও মনে মনে করেছে। আর তার এই বিরোধিতা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার হিংসা-বিদ্বেষ ও নোংরামীও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদীনা গমন ও বদরের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এ থেকে একদিকে তার হিংসা-বিদ্বেষ আর অন্যদিকে নবী করীম (সা.)-এর ধৈর্য্যশক্তির বিষয়টি প্রকাশ পায়।

এটা আসলে ক্ষমার বহিঃপ্রকাশ ছিল। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ও নবী করীম (সা.)-এর ব্যক্ত করা প্রতীক্রিয়া থেকে ক্ষমা করার বিষয়টি আরো বেশি দ্যূতি ছড়ায়। যাইহোক, রেওয়ায়েত আছে যে, ইমাম যোহরী বলেন, উরওয়া বিন যুবায়ের বলেন, উসামা বিন যায়েদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ফিদক অঞ্চলের একটি চাদর জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গাধায় চড়ে এবং উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে পিছনে বসিয়ে অসুস্থ সা'দ বিন উবাদাহকে দেখার জন্য বনু হারেস বিন খাযরাজে যাচ্ছিলেন। এটি বদরের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। যাবার সময় এমন একটি সমাবেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল বসে ছিল। সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি।

নবী করীম (সা.) দেখলেন, সমাবেশটিতে মূর্তি পূজারী ও ইহুদিরাও বসে আছে এবং আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাও বসে ছিলেন। এ সমাবেশের লোকদের গায়ে যখন গাধার পায়ের ধূলা উড়ে গিয়ে পড়ল তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল নিজের চাদর দিয়ে তার নাক ঢেকে বলল, আমাদের উপর ধূলা উড়িও না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গাধা থেকে নেমে সবাইকে সালাম দিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন ও কুরআন করীম পাঠ করে শোনালেন।

এ প্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল বলল, হে মহাশয়! আপনি যে বিষয়ে কথা বলছেন তা কোন ভাল কথা না। আর কথা সঠিক হলেও এ সমাবেশে শুনিয়ে আমাদের কষ্ট দিবেন না। নিজের বাড়িতে যান আর সেখানে যারা আসবে তাদেরকে কুরআন পড়ে শোনান গে, যান। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা বললেন, কেন নয়?

হে রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাদের সমাবেশ গুলোতে এসে কুরআন পাঠ করে শোনাবেন, কেননা কুরআন শুনতে আমাদের খুব ভাল লাগে। এ কথা শোনা মাত্রই মুসলমান, মুশরেক ও ইহুদিরা এমন ভাবে বিতর্ক শুরু করল যে একেবারে মারামারির উপক্রম। নবী করীম (সা.) তাদেরকে অনবরত চুপ করাতে থাকলেন। আর তারা শান্ত হওয়ার পর তিনি (সা.) তাঁর বাহনে চড়ে সা'দ বিন উবাদার বাড়ি পৌঁছলেন। তিনি (সা.) সা'দ বিন উবাদাকে জানালেন, আবু হাব্বাবা অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল কী কী বলেছে। এ কথা শুনে সা'দ বিন উবাদাহ্ বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মার্জনা করুন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনার প্রতি এই মহান ধর্মগ্রন্থ কুরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এটিকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে সত্যকে আনয়ন করেছেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা এই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে তাদের বাদশাহ বানানোর এবং তার বাহুকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আপনার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত সত্যের এই করুণা বর্ষণের ফলে মানুষ তাকে অস্বীকার করে, এতে সে খুব

কষ্ট পায়। এ জন্য সে আপনার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে মার্জনা করেছিলেন কিন্তু তা এ জন্য নয় যে, সা'দ বিন উবাদাহ্ মার্জনা করতে বলেছিলেন। বরং তিনি (সা.) তাঁকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, সে আজ আমার সাথে এমন মন্দ আচরণ করছে কিন্তু আমি তো তাকে মার্জনা করব। আরো লিখেছেন, আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী তিনি (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ মুশরেক ও আহলে কিতাবদের সাথে মার্জনাপূর্ণ আচরণ করেছেন। আর তাঁরা তাদের কাছ থেকে পাওয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করতেন। কিন্তু কিছু কাল পর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল যখন বাহ্যিক ভাবে মুসলমান হয়ে গেল তখন সে তার কপটতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে নবী করীম (সা.) কে সর্বদা কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করতে থাকল।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি একবার একটি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে একজন মুহাজের একজন আনসারের পিঠে থাপ্পড় মারে, এতে আনসার লোকটি উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলে, হে আনসারগণ! তোমরা আমাকে সাহায্য কর। অবস্থা বেগতিক দেখে সে মুহাজেরও উচ্চ স্বরে বলে, হে মুহাজেরগণ! তোমরা আমাকে সাহায্য কর। নবী করীম (সা.) এ সব আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় উচ্চ স্বরে চেচামেচি হচ্ছে কেন? উত্তরে নবী করীম (সা.)-কে বলা হল, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! একজন মুহাজের একজন আনসারের পিঠে থাপ্পড় মেরেছে। নবী করীম (সা.) বললেন, তোমরা এমন করা ছেড়ে দাও কেননা এটি একটি মন্দ কাজ। একজন বলে আমি আগে পান করব, আরেক জন বলে আমি আগে পান করব; এভাবেই পানি পান করা নিয়ে ঝগড়াটি শুরু হয়। পরবর্তীতে মুনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এ বিষয়টি জানার পর বলে, মুহাজেররা এমন করেছে? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যদি মদীনায় ফিরত যেতে পারি তবে মদীনার সম্মানিত ব্যক্তি মদীনার লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে (নাউযুবিল্লাহ্) বের করে দেবে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানতে পারলেন। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। হযরত উমর (রা.)-এর এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বললেন, তাকে ক্ষমা করে দাও। মানুষ যেন এ কথা বলতে শুরু না করে যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সঙ্গীদেরও হত্যা করে।

(বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর, হাদীস নং ৪৯০৫)

তার এমন আচরণের পরও মহানবী (সা.) তাকে নিজের সঙ্গী বলে সম্বোধন করেছেন। কেননা বাহ্যিক ভাবে সে নিজেকে মুসলমান দাবি করছিল। অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী করীম (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল ও তার সাথীদের ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করেন, এমন শুনলাম, আসলে ঘটনাটা কী? তারা সবাই এ বিষয়টি অস্বীকার করল এবং কয়েকজন আনসারী সুপারিশ করল, আর বলল, যায়েদ ছোট ছেলে তো তাই সে এ বিষয়টি ভুল বুঝেছে।

নবী করীম (সা.)ও আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। আল্লাহ্ তাআলা যখন ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে জানালেন, এ ঘটনা সত্য তখন সে যুগের লোকরাও বুঝতে পারল, এ ঘটনাটি আসলেই সত্য ছিল। কুরআন করীমে এ বিষয়টি এভাবে এসেছে,

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দিবে। আসলে সব সম্মান আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের ও মু'মিনদেরই। কিন্তু মুনাফেকরা (তা) জানে না। (সূরা আল্ মুনাফেকুন-৯) এ ওহীর পর নবী করীম (সা.)-এর চেয়ে বেশি আর কে জানতে পারে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল একজন মুনাফেক ও মিথ্যাবাদী। বরং তিনি (সা.) তার বিচক্ষণতার দ্বারা পূর্বে থেকেই জানতেন, সে মুনাফেক, কিন্তু তিনি (সা.) উপেক্ষা করে যাচ্ছিলেন। (যুদ্ধ থেকে) মদীনায় প্রবেশের পূর্বেই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের নিষ্ঠাবান মুসলমান যুবক পুত্র নবী করীম (সা.)-কে বলে, আমি তো এমন কথা শুনলাম। আপনি যদি তাকে হত্যার ইচ্ছা রাখেন তবে আমাকে আদেশ দিন, আমি নিজেই আমার পিতার শিরচ্ছেদ করব।

কেননা কেউ যদি তাকে হত্যা করে বা কোন শাস্তি দেয় তবে হয়তো আমার অজ্ঞতার যুগের ক্রোধ পুণরায় ফিরে আসতে পারে এবং হয়তো আমি সেই ব্যক্তিকেই হত্যা করে ফেলতে পারি, যে আমার পিতাকে হত্যা করবে। এ কথা শুনে নবী করীম (সা.) বললেন, এমন কোন বিষয় নেই, আর কোন ধরণের শাস্তি দেয়ার ইচ্ছাও আমি পোষণ করছি না। বরং তোমার পিতার সাথে আমি নম্রতা ও অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করব। এমন নয় যে, কোন শাস্তি দিব বরং নম্রতা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করব।

(সিরাতুন্ নবী, ইবনে হিশাম, গাযওয়া বণী মুস্তালেক, পৃষ্ঠা ৬৭২)

এটি সেই অভিযান ছিল যাতে হযরত আয়শা (রা.) ভুলক্রমে পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। কাফেলা রওয়ানা দেয়ার পর এক সাহাবী অবস্থানস্থলে অনুসন্ধান করছিলেন, কাফেলার কোন জিনিস রয়ে গেছে কিনা। তিনি যখন আয়শা (রা.)-কে দেখলেন তখন

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

পড়লেন, এ আওয়াজ শুনে তিনি রাযি আল্লাহু আনহা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হলেন এবং নিজের উপর চাদর জড়িয়ে নিলেন। সেই সাহাবা (রা.) আয়শা (রা.)-এর পাশে তার উটটি এনে বসালেন এবং তিনি (রা.) তাতে উঠে বসলেন। পরবর্তীতে তারা যখন সেই কাফেলার সাথে মিলিত হলেন তখন সেই মুনাফেকরাই হযরত আয়শা (রা.) সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের অপপ্রচার চালাতে লাগল। হযরত আয়শা (রা.)-এর উপর (নাউযুবিল্লাহ্) বাজে ধরণের অপবাদ দিল। এতে নবী করীম (সা.)-এর মাঝে কিছুটা অস্থিরতা বিরাজ করছিল। প্রকৃত পক্ষে

হযরত আয়শা (রা.)-এর উপর অপবাদ দেয়ার অর্থ ছিল নবী করীম (সা.)-এর ক্ষতি সাধন করার মত বিষয় বা চেষ্টা। এ ঘটনার পর মদীনায় পৌঁছে একদিন মহানবী (সা.) মসজিদে এসে বক্তৃতা দিলেন। এ বক্তৃতার প্রথম বাক্যটি এমন ছিল, আমাকে আমার পরিবারের বিষয়ে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি (সা.) মুনাফেকদের অপবাদ সহ্য করেছেন।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস নং ৪১৪১)

তবুও তিনি (সা.) যারা এমন অপবাদ দিয়েছিল তাদেরকে তাৎক্ষনিক ভাবে কোন শাস্তি দেন নি। আর হযরত আয়শা (রা.)-এর নির্দোষ হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী হওয়ার পরও তাদের শাস্তি দেন নি, যাদের সম্বন্ধে জানা ছিল– এরা অপবাদ লাগিয়েছে, তাদেরকেও তিনি (সা.) মার্জনা করেছেন।

একটি বর্ণনায় রয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল যখন মারা গেল তখন তার ছেলে (যেভাবে আমি বলেছি, তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন) নবী করীম (সা.)-কে বললেন, আপনি আপনার জামাটা দিলে এ জামা দিয়ে আমি আমার পিতার কাফন দিতাম। তিনি (সা.) তাঁর জামাটি দিয়ে দিলেন। বরং তাঁর (সা.) অনুগ্রহ ও মার্জনা প্রদর্শনের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি (সা.) তার জানাযা পড়েন এবং কবরে দোয়াও করেন।

হযরত উমর (রা.) বললেন, এ ব্যক্তি মুনাফেক আর আল্লাহ্ তাআলা মুনাফেক সম্বন্ধে বলেন, তুমি যদি তাদের জন্য ৭০ বারও ইস্তেগফার কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও তারা ক্ষমা পাবে না। এ বিষয়গুলো জানার পরও আপনি এমন করলেন। উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তাআলা এতে এ অনুমতিও দিয়ে রেখেছেন তাই আমি তার জন্য ৭০ বারের বেশি ইস্তেগফার করার চেষ্টা করব। তার জন্য প্রয়োজনে আমি এরচেয়ে অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করব।

এই ছিল নবী করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ যা তিনি মুনাফেকদের সাথে প্রদর্শন করেছেন।

(বুখারী, কিতাবুল জানাযা, হাদীস নং ১২৬৯)

এটা তো গেল মুনাফেক সর্দারের সাথে ক্ষমা ও মার্জনাপূর্ণ আচরণ।

এখন আমি অন্য আরো কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি। যেমন- মূর্খ ও অশিক্ষিত বেদুঈন, যাদের মধ্যে কোন প্রকার ভদ্রতা ছিল না এবং যারা নবী করীম (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখত না। এদের সাথে মহানবী (সা.)-এর মার্জনাপূর্ণ আচরণ সম্বন্ধে একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি (সা.) মোটা পাড় ওয়ালা একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। এক বেদুঈন তাঁর চাদরটি এতো জোরে টেনে ধরে যে মহানবী (সা.)-এর ঘাড়ে পাড়ের দাগ পরে যায়।

এরপর সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে যে সম্পদ দান করেছেন সেখান থেকে আপনি আমাকে দুটি উট দিন। আপনি তো আমাকে আপনার নিজের বা আপনার বাপ-দাদার কোন সম্পদ দিচ্ছেন না। তার এমন শক্ত কথা শোনার পর মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন এবং এরপর বললেন,

المال مال الله و انا عبده

সম্পদ তো আল্লাহ্‌রই কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতঃপর নবী করীম (সা.) বললেন, তুমি আমাকে যে কষ্ট দিয়েছো সেটার প্রতিশোধ নেয়া হবে। বেদুঈন বলল, আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে না। নবী করীম (সা.) বললেন, তোমার কাছ থেকে কেন প্রতিশোধ নেয়া হবে না? সেই বেদুঈন বলল, কেননা আপনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা গ্রহণ করেন না।

তার এ কথা শুনে নবী করীম (সা.) হেসে ফেললেন। এটাই ছিল সেই নম্র ব্যবহার যার আরেক নাম মার্জনা। এ বিষয়টি-ই মানুষের মাঝে যা খুশি করার সাহসের সঞ্চার করেছিল। মহানবী (সা.) বললেন, তার চাওয়া উট দুটির একটিতে যব এবং অন্যটিতে খেজুর তুলে তাকে দিয়ে দাও।

(আশ্‌শেফা, কাযী আইয়ায, বাব সানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৪)

এখন আমি ইসলাম বিরোধীদের সাথে নবী করীম (সা.)-এর মার্জনাপূর্ণ আচরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, মক্কার কুরাইশদের মধ্য থেকে আশি জন লোক ফযরের নামযের সময় জাবলে তানীম থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে হত্যা করা। কিন্তু তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। (সুনান তিরমিযী, কিতাবুত্ তফসীর হাদিস নং ৩২৬৪)

এখন এমন কয়েকটি ক্ষমার উদাহরণ উপস্থাপন করব যারা যুদ্ধাপরাধী ছিল। কিন্তু মূর্তিমান অনুগ্রহ ও মার্জনা প্রদানকারী সত্তা তাদেরকেও ক্ষমা করছেন এবং বলেছেন, যাও তোমাদের জন্য কোন ভর্ৎসনা ও শাস্তি নেই। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, হিশাম বিন যায়েদ বিন আনাস বলেন, আমি আনাস বিন মালেক (রা.) কে বলতে শুনেছি, একবার এক ইহুদি নবী করীম (সা.)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় السلام عليكم -এর পরিবর্তে বলল السام عليكم অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ সে কি বলেছে? অতঃপর নবী করীম (সা.) বললেন, সে السام عليكم বলেছে। সাহাবিগণ ইহুদির এমন আচরণ দেখে বললেন, আমরা কি তাকে হত্যা করব না? মহানবী (সা.) বললেন, না তোমরা তাকে হত্যা করবে না।

(বুখারী, কিতাবুল ইসতেতাবাতিল মুরতাদীন, হাদীস নং ৬৯২৬)

তিনি (সা.) এ শিক্ষাও দিলেন যে, আমার অনুগ্রহ কেবল নিজেদের জন্য নয় বরং আমার উপর যারা অত্যাচার করে তাদের জন্যও। শাস্তি শুধু এমন অপরাধীদের জন্য প্রযোজ্য হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছেন। যাদের সম্পর্কে কুরআন করীমে সুস্পষ্ট আদেশ রয়েছে অথবা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁকে (সা.) জানিয়েছেন।

একবার এক ইহুদি মহিলা মাংসের সাথে বিষ মিশিয়ে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের (রা.) খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল।

অপরাধ স্বীকারের পরও তিনি (সা.) তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ রাগান্বিত হয়ে অনুমতি চেয়েছিলেন, 'আমরা তাকে হত্যা করি'? মহানবী (সা.) বললেন, না, কোন ক্রমেই না।

(বুখারী, কিতাবুল হিবাহ্, বাব কবুলুল হাদীয়া মিনাল মুশরেকীন, হাদীস নং ২৬১৭)

ওয়াহশী, যে হযরত হামযা (রা.)-কে ওহুদের যুদ্ধে শহীদ করেছিল সে বলে, হামযা (রা.)-কে শহীদ করার পর আমি মক্কায় ফিরে এসে। মক্কাতেই জীবনযাপন করতে থাকি। পরে মক্কার চতুর্দিকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে আমি তায়েফ চলে গেলাম। তায়েফবাসী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে তাদের প্রতিনিধি দল পাঠালো এবং আমাকে বলল, মহানবী (সা.) মুখপাত্রদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। কাজেই আমিও প্রতিনিধি দলের সাথে যোগ দিলাম, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম।

নবী করীম (সা.) আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি ওয়াহশী? আমি বললাম হ্যা আমি ওয়াহশী। নবী করীম (সা.) বললেন, তুমি-ই কি হামযা (রা.) কে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, আপনি যেমনটি শুনেছেন ঘটনা তেমনই। সে বলে, মহানবী (সা.) আমার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে বললেন, আমার সামনে না আসাটা কি তোমার জন্য সম্ভব? মহানবী (সা.)-এর এ কথার পর আমি মদীনা থেকে চলে আসি।

(বুখারী কিতাবুল মাগাযী হাদীস নং, ৪০৭২)

নবী করীম (সা.)-এর চরম মার্জনা সম্পর্কে আরো বেশি জানা যায় যখন নবী করীম (সা.) ওয়াহশীকে হযরত হামযা (রা.) কে শহীদ করার ব্যাপারে অধিক জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে শহীদ করেছিলে এবং এরপর কি কি করেছিলে? সাহাবাগণ (রা.) বলেন, তখন নবী করীম (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ছিল।

নিশ্চয় স্বীয় চাচার স্মৃতি তাজা হওয়ায় এ অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল। সেই চাচা যিনি আবু জেহেলের বিরুদ্ধে তাঁর (সা.) সঙ্গ দিয়েছিলেন এবং তাঁর (সা.) পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যাকান্ডে প্রধান ভূমিকা রাখার পরও মহানবী (সা.) অনুগ্রহ ও মার্জনা করে সেই ওয়াহশীকে পর্যন্ত ক্ষমা করে দিলেন। (আল কামেল ফী তারিখ ইবনে আছির, ফাতাহ্ মাক্কা, পৃষ্ঠা ২৫৮)

মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (সা.) ইকরামা বিন আবু জেহেলকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। কেননা সে ও তার পিতা নবী করীম (সা.) ও মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করত। ইকরামা যখন শুনল মহানবী (সা.) তাকে হত্যার আদেশ জারি করেছেন তখন সে ইয়েমেন-এর দিকে পলায়ন করল।

তার পিছনে পিছনে তার স্ত্রী, যে ছিল তার চাচাতো বোন এবং হারেস বিন হিশামের মেয়ে। সে ইসলাম গ্রহণ করার পর তার খোঁজে গিয়েছিল এবং তাকে সমুদ্র তীরে জাহাজের জন্য অপেক্ষা রত পেয়ে ছিল। একটি বর্ণনায় রয়েছে, ইকরামাকে তার স্ত্রী জাহাজে আরোহণ করা অবস্থায় পায় এবং তার সাথে কথা বলার পর সে ফিরে আসে।

তার স্ত্রী তাকে বলে, হে আমার চাচার ছেলে! আমি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, সর্বোত্তম অচরণের অধিকারী এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পক্ষ থেকে এসেছি, তুমি তোমার নিজ সত্তাকে ধ্বংস করো না। আমি তোমার জন্য নিরাপত্তার বার্তা নিয়ে এসেছি। ফিরে চল, নবী করীম (সা.) তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং কিছুই বলবেন না।

ইকরামা তার স্ত্রীর সাথে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার স্ত্রী আমাকে বলেছে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন। মহানবী (সা.) বললেন, সে ঠিক বলেছে, তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। এ কথা শোনা মাত্র ইকরামা বলল,

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له و انك عبده و رسوله

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর লজ্জায় ইকরামা তার মাথা হেট করে রইল। এ অবস্থায় নবী করীম (সা.) বললেন, হে ইকরামা! তুমি যদি আমার কাছে এমন কিছু চাও যা আমার সাধ্যের মধ্যে রয়েছে তবে আমি তা তোমাকে দিব। ইকরামা বলল, আপনি আমার সেই সব কঠোরতা ক্ষমা করে দিন যা আমি আপনার সাথে করেছি। এ কথা শুনে নবী করীম (সা.) দোয়া করলেন,

اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة
عادانيها و منطق تكلم به

অর্থাৎ হে আমার খোদা! আমার সাথে করা ইকরামার প্রতিটি কঠোরতা তুমি ক্ষমা করে দাও। অথবা তিনি (সা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্ ! ইকরামা আমার সম্বন্ধে যা কিছু বলেছে তা তুমি ক্ষমা করে দাও। এ ধরণের ক্ষমার আর কোন দৃষ্টান্ত রয়েছে কি? (اللهم صل علي محمد و

علي ال محمد و بارك
و سلم انك حميد مجيد

(সিরাতুল হালবিয়া, আল্লামা আবুল ফরজ নুরুদ্দীন, যিকরে ফাতাহ্ মক্কা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩২)

মক্কা বিজয়ের সময় নবী করীম (সা.) যখন কাবা শরীফ তোয়াফ করছিলেন তখন ফুযালা বিন হুমায়ের নামের এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) কে হত্যা করার মানসে তাঁর কাছে আসে।

আল্লাহ্ তাআলা তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবী করীম (সা.) কে অবগত করেন। তিনি (সা.) তাকে ডাকেন, ডাকার পর সে ভয় পেয়ে যায়। অতঃপর তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছো? জানা কথা যে ধরা পরার পর সে মিথ্যা বলবে, তাই সে বাহানা বানাতে থাকে।

নবী করীম (সা.) মুচকি হেসে আদর করে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তার বুকে নির্ভয়ে নিজ হাত রাখলেন। এটা জানার পরও যে সে কি উদ্দেশ্যে এসেছে এবং তার কাছে অস্ত্রও আছে। ফুযালা বলে, মহানবী (সা.) যখন তাঁর হাত আমার বুকে রাখলেন তখন আমার সব ঘৃণা দূর হয়ে গেল। যে সত্তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম তাঁর এ অনুগ্রহপূর্ণ হাত আমার মনে তাঁর জন্য ভালবাসার সমুদ্র প্রবাহিত করল।

(সিরাতুন নবুবীয়াহ্, ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৭৪৭)

অতএব, এই হল- নিজের শত্রুর সাথে আমার নেতার আচরণ। অপরাধী ধরা পড়ার পরও তাকে শাস্তির পরিবর্তে ভালবাসার তীর দিয়ে এমন ভাবে ঘায়েল করতেন যে, সে তাঁর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। এমন কি কেউ আছে যে এই অনুগ্রহ ও মার্জনার মোকাবেলা করতে পারে?

আল্লাহ্ তাআলার এ আদেশ সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 'মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। কাজেই বর্তমান যুগের মুসলমানদেরও সেই আদর্শের অনুসরণের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। হায়! যদি তারা বুঝত।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্যে থেকে কোন একটিকে বেছে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে তখনই তিনি সে দুটির মধ্যে থেকে সহজতরটি বেছে নিতেনআর গ্রহণ করতেন কেবল সেটা যা গ্রহণ করলে কোন পাপ হয় না। আর যেটা গ্রহণ করলে পাপ হয় সেটা থেকে তিনি সবার চেয়ে দূরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের সত্তার জন্য কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু কেউ যদি অন্যায় পন্থায় আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারিত সীমা রেখা লঙ্ঘন করত তবে তিনি (সা.) তাকে আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে শাস্তি দিতেন।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, হাদীস নং ৩৫৬০)

হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, 'একবার তিনি আলাপচারিতার ফাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতির বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করেছিলেন,

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ
مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

অর্থাৎ হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! এ ধরা পৃষ্ঠে কাফেরদের কোন গৃহবাসীকেই তুমি রেহাই দিও না।

(সূরা নূহ-২৭)

হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আপনি যদি আমাদের জন্য নূহের মত বদ-দোয়া করতেন তবে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতাম। আপনার কোমরে ব্যথা দেয়া হয়েছে, আপনার পবিত্র মুখমন্ডলকে রক্তাক্ত করা হয়েছে, আপনার সামনের দিকের দাঁত শহীদ করা হয়েছে কিন্তু আপনি শুধু কল্যাণের কথা বলেছেন এবং এ দোয়া করেছেন,

اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون

অর্থাৎ হে খোদা! আমার জাতিকে ক্ষমা কর, তারা কি করছে তা তারা জানে না।'

(আশ্‌শেফা, কাজী আইয়ায, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) মক্কাবাসী ও অন্যদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনের পর এবং তাদের তাঁর তরবারির নিচে দেখার পর তাদের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেবল গুটি কয়েক সে সব ব্যক্তিকেই শাস্তি দিয়েছিলেন যাদের শাস্তি দেয়ার জন্য অদ্বিতীয় খোদার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট আদেশ দেয়া হয়েছিল। সেই সব অতি নিকৃষ্ট অভিশপ্তরা ব্যতীত অন্য সব শত্রুর পাপ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর বিজয়ী হওয়ার পর

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

(সূরা ইউসূফ-৯৩)

এ অপরাধ মার্জনার ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের কাছে যে বিষয়টি অসম্ভব মনে হতো এবং নিজেদের দুষ্টামির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাদের নিজেদেরকে প্রতিপক্ষের হাতে সমর্পিত অবস্থায় দেখে মৃত্যুদণ্ডই যুক্তিসম্মত মনে করত, এমন হাজারো মানুষ এক মুহূর্তের মধ্যে ইসলাম ধর্ম কবুল করল।'

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খন্ড, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬-২৮৭)

অতএব, এ হল নবী করীম (সা.)-এর মার্জনা, যা বিরোধিদের কাছে বাহ্যিক ভাবে অনেক কঠিন বিষয় ছিল। এ ধরণের মার্জনাও করা সম্ভব! কিন্তু তারা যখন নবী করীম (সা.) কাছ থেকে এমন উত্তম আচরণ প্রত্যক্ষ করল তখন এর এমন ফলাফল হল যে, বিরোধীরাও ইসলাম গ্রহণ করল।

হায়! যদি বর্তমান যুগের মুসলমানরাও এ বিষয়টি অনুধাবন করত, তবে ইসলামের এ বাণী আরো অনেক উন্নতি লাভ করত। হায়! যদি এ সব লোক সন্ত্রাসবাদী গোত্রের থাবা থেকে বের হয়ে এই জীবনাদর্শের কথা ভাবত, যে আদর্শ আমাদের নেতা ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা তাদের জ্ঞান দান করুন, আমীন।

অনুবাদ:
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org;www.mta.tv

হযরত উমর (রা.)

মূল: মাশহুদ আহমদ এবং ফজল আহমদ

ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ

(২য় কিস্তি)

আবু বকরের (রা.) অধীনে উমরের (রা.) ভূমিকা

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা হন। তিনি মাত্র দুই বছর সময়কাল নেতৃত্ব দিয়েছেন। হযরত আবু বকরকে (রা.) অনেক শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন হযরত উমর (রা.)। মুহম্মদ বিন শিরিনের একটি সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, যা আবু আব্দুল্লাহ রেকর্ড করেছিলেন, উমরের (রা.) খিলাফতকালে কিছু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হযরত উমর (রা.) জানতে পেলেন যে, লোকেরা বলাবলি করছে তারা আবু বকরের (রা.) উপর উমরকে (রা.) প্রাধান্য দেয়। তখন উমর (রা.) বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদেরকে মনে করিয়ে দেন, হিজরতের সময় সওর গুহাতে আবু বকরেরই (রা.) সৌভাগ্য হয়েছিল মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে থাকার। মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তাবিধানে তিনিই সামনে-পেছনে নজর রেখেছিলেন, রাত জেগে পাহাড়া দিয়েছিলেন।

হযরত উমর (রা.) বলেন, "তার নামেও (কসম করছি) যার হাতে আমার প্রাণ, উমরের পুরো কবিলা/উপগোত্র থেকে সেই রাতটি উত্তম।"

(Helminski p. 41)

সেই সময়ে হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকরের (রা.) ঘনিষ্ট পরামর্শদাতা ও সহযোগিদের মধ্যে একজন ছিলেন। এটা হযরত উমরই (রা.) ছিলেন যিনি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরকে বিবাদে লিপ্ত হতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরকে (রা.) অনুপ্রাণিত করেছিলেন কুরআনের আয়াতগুলো একত্রিত করে একটি পুস্তকের আকার দান করতে, যেন সেগুলো হারিয়ে না যায়। (বুখারী, ভলিউম ৬, ৬০.২০১)। হযরত উমরের এই পরামর্শে সম্মত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.) এই দায়িত্ব অর্পণ করেন যায়িদ বিন সাবিত (রা.)-এর প্রতি।

হযরত মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের কতিপয় গোত্র ইসলামের সঙ্গে তাদের আনুগত্যের সম্পর্ক অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে ভণ্ড নবীর দাবীদাররাও এই শূণ্যতার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। অনেকেই ভাবছিল প্রতিটি গোত্রেরই উচিৎ নিজেদের জন্য পৃথক পৃথক ইমাম নিযুক্ত করা। তাদেরকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় আরবে একই মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভূক্তকরণে এবং একজন খলিফার অধীনে আনয়নের ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.) ভূমিকা রেখেছিলেন।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা.) মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) দ্বিতীয় খলিফা নিযুক্ত হন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) হযরত উমরের খিলাফত প্রাপ্তি সম্পর্কে লিখেছেন:

"মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের (রা.) উপস্থিতিতে এভাবে উত্তরসূরী হিসেবে হযরত উমরকে (রা.) মনোনীত করেন হযরত আবু বকর (রা.)। তাই হযরত উমরের (রা.) আনুগত্য করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। তদ্রূপ হযরত উমরও (রা.) ছয় জন ব্যক্তিকে মনোনীত করেন পরামর্শকারী (নির্বাচকমণ্ডলী) হিসেবে, যারা তার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফা নিযুক্তির জন্য পরামর্শ করবেন। (ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা: ১৬৭)।

একইভাবে, আল-তাবারিও একটি কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) কথা বলছিলেন হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে:

"আবু বকর বলেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, আমাকে উমর সম্পর্কে বলো।' উসমান বলেন, 'হে আল্লাহ্ তার সম্পর্কে আমার যতটুকু জানাশোনা তা হলো, তিনি গোপনে যে-সব কাজ সম্পাদন করেন সেগুলো তার প্রকাশ্যে সম্পাদিত কাজের চেয়ে অধিকতর উত্তম। আর আমাদের মধ্যে কেউই তার সমকক্ষ নয়।'"

(তাবারি, ভলিউম ১১, পৃষ্ঠা: ১৪৬)

এর অর্থ হলো, জনসমক্ষে সম্পাদিত তার কাজগুলো এত মহান ছিল যে, তা থেকে অনুমান করা যায় তার দ্বারা গোপনে সম্পাদিত কাজগুলো সম্পর্কে। সেগুলো আরো উচ্চ পর্যায়ের ছিল এবং সম্পর্ক রাখতো তার আধ্যাত্মিক রঙ ও চরিত্রের সঙ্গে। হযরত আবু বকর (রা.) পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন তার পরে হযরত উমর (রা.) দ্বিতীয় খলীফা হবেন।

খলীফার বেশে হযরত উমর (রা.)

খলীফা হিসেবে উচ্চতম মর্যাদা লাভ করার পর তার উগ্রতা রূপান্তরিত হয় হৃদয়ের উষ্ণতায় এবং নম্রতায়। খলীফা হওয়ার পর তার প্রথম দিকের জুমুআর খুতবাগুলোর একটিতে নিম্নোক্ত ভাষায় তিনি তার অনুবর্তীদের প্রতি আহ্বান জানান:

"রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তোমরা আমার অংশীদার। তোমাদের ভাল পরামর্শ দ্বারা আমাকে সাহায্য করো। আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে চলি তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। আমি যদি বিপথগামী হই, আমাকে সংশোধন করো। তোমাদের পরামর্শ ও মতামত দ্বারা আমাকে শক্তিশালী করো।"

(Helminski p. 406)

স্যার উইলিয়াম মুইর তার *The Caliphat* পুস্তকে লিখেছেন, প্রথমাবস্থায় উমর (রা.) যে কাজগুলো করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল ট্রেজারি বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার/বাইতুল মাল খতিয়ে দেখা। সেখানে ভাঁজ করে রাখা

বস্তার তলায় তিনি সামান্য ক'টি পয়সা পেলেন, যা নির্দেশ করছিল যে, রাষ্ট্র কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের সবটুকুই হযরত আবু বকর (রা.) বণ্টন করে দিয়েছেন। এতে হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিতকরণের কাজে হযরত উমর (রা.) বিখ্যাত হয়েছিলেন।

সেই যুগে বিরাজমান আদর্শ হিসেবে, খলীফা হওয়ার বিষয়টি তাকে সম্পদ ও ক্ষমতার অপরিমেয় অপব্যয় ও ভোগবাদী জীবনের দিকে পরিচালিত করতে পারতো। অতিকায় প্রাসাদে বসবাস, দরবার ও অন্যান্য বিলাস-ব্যসন যেমন, চাকচিক্যময় পোশাক এবং শত শত দাস-দাসী রেখে আরাম-আয়েশ করার দিকে ঝুঁকতে পারতেন তিনি। কিন্তু এসব কিছুই ছিল না এই মহান খলীফার মাঝে। সাদাসিধা জীবন-যাপনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। তার পরিধানের কাপড় খুবই সাধারণ ছিল। তার অনুসারীদের মতোই সাধারণ খাবার খেতেন তিনি। একবার তিনি বলেছিলেন:

"গ্রীষ্মে একটি এবং শীতে একটি জামা ছাড়া আল্লাহ্‌র এই মাল-সামানের কিছুই আমার জন্য নয়। যা হজ্জের জন্য এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট। আর আমার খাবার ও পরিবার-পরিজনের ব্যয়ের জন্য আমার লোকদের মধ্যম হার আমার জন্য। এর বাইরে, অন্য যে-কোন মুসলমানের মতোই আমার অতিরিক্ত কোনো অধিকার নেই।"

(Helminski p. 408)

হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর একটি মাত্র জামা ছিল আর সেটাও ছিল তালি মারা। অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় খেজুর/তাল গাছের পাতায় তৈরি বিছানাতে তিনি ঘুমাতেন।

সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তিদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা কতোটুকু রয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য প্রায়ই তিনি রাতের আঁধারে মদিনার অলি-গলিতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। মানুষ কীভাবে ঘুমুচ্ছে, তাদের খাবার, পানি আছে কিনা, কাপড় আছে কিনা, তারা নিরাপদ আছে কিন্তু এসব দেখার জন্য তিনি (রা.) রাস্তায় টহল দিতেন।

এমনকি একদিন তিনি যখন রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তিনি লক্ষ করলেন, এক মহিলা একটি হাড়িতে কিছু রান্না করছে আর তার বাচ্চারা তাকে ঘিরে অপেক্ষা করছে। জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারলেন, হাড়িতে কোন খাবার নেই, বাচ্চাদের প্রবোধ দেওয়ার জন্য সেটি চুলায় চাপানো হয়েছে। আরো জানা গেল, দু'দিন ধরে তারা কিছু খায় নি। হযরত উমরের (রা.) চোখে পানি চলে আসলো। হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ বাইতুল মাল-এ চলে গেলেন এবং মহিলার জন্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসলেন। একজন কর্মচারী সেগুলো বহন করতে চাওয়ায় হযরত উমর (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বস্তা স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিয়ে বললেন, কেয়ামতের দিন আমার বোঝা কে বহন করবে? খাদ্যদ্রব্য সেই মহিলাটির কাছে পৌঁছে দিয়ে তিনি বললেন, সে যেন মাসোহারা নেওয়ার জন্য নিয়মিত বাইতুল মালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। মহিলাটি হযরত উমরকে (রা.) চিনতে পারে নি। সে খুব খুশী হলো। তখন পর্যন্ত যেহেতু সে জানতো না যে এই লোকটি কে, তাই সে চিৎকার করে বললো:

"উমরের জায়গায় আল্লাহ্ তোমাকে খলীফা করুন।"

(তাবারি, ভলিউম ১৪, পৃষ্ঠা: ১১০-১১১)

এতে হযরত উমর (রা.) কাঁদতে লাগলেন এবং আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। তার লোকদের জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর কী রকম সমবেদনা ছিল এটি হচ্ছে তারই একটি চিত্র।

আরেকটি ঘটনায় দেখা যায়, একবার গ্রিসের এক রাষ্ট্রদূত মদিনায় এসেছিল। ঘোড়া ও মালপত্র নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য সে রাস্তার লোকদের কাছে খলিফার প্রাসাদের খোঁজ চাচ্ছিল। একথা শুনে একজন দর্শক সেই রাষ্ট্রদূতকে কী বলেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন জালালুদ্দিন রুমি:

"তার কোন প্রাসাদ নেই। উমরের একমাত্র প্রাসাদ হলো তার অত্যুজ্জ্বল আধ্যাত্মিকতা। আমিরুল মু'মিনীন হিসেবে যদিও তিনি বিখ্যাত, তবুও গরীব লোকের মতো তার একমাত্র বাসস্থান হলো একটি কুঁড়েঘর।

(Helminski p. 159)

তাঁর সম্পর্কে প্রায়ই বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের বিনয় বজায় রাখার জন্য তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন, খাদেমদের হাত লাগাতে দিতেন না। এ রকম একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন উরওয়াহ বিন আজ-যুবায়ের। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, কাঁধে পানির মশক নিয়ে এদিক-ওদিক হাঁটাচলা করাটা একজন খলীফার জন্য শোভনীয় নয়। এর জবাব হযরত উমর (রা.) নিম্নোক্ত ভাষায় দেন:

"যখন আমার কাছে বিভিন্ন প্রতিনিধি এসেছিল, তারা আমার কথা শুনছিল এবং আনুগত্য প্রকাশ করছিল। তখন আমার আত্মায় ঔদ্ধত্য প্রবেশ করে। তাই আমি সেটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চেয়েছিলাম।"

(Helminski p. 160)

মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসার অগ্রগতিসাধন করেছেন তিনি। আল-গাজ্জালীর On Duties of Brotherhood পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর বলেন:

"অকৃত্রিম ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা প্রকাশের তিনটি উপায় আছে: তাকে সালাম সম্ভাষণ করো, যখন তার সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করো তাকে স্বস্তিপূর্ণ/চিন্তামুক্ত করো এবং তাকে তার পছন্দের নামে ডাক।"

একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত এটি খলিফার কাছে প্রত্যাশিত হলেও ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার অধীনে বসবাসকারী অমুসলিমদের প্রতিও তিনি ভালবাসা ও সমবেদনা প্রদর্শন করেছেন। তিনি যখন সিরিয়ায় গিয়েছেন, তখন তিনি এক বৃদ্ধকে দেখলেন পথে-পথে ভিক্ষা করতে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন সেই বৃদ্ধ একজন ইহুদি। তিনি বিচলিত হলেন এবং সিরিয়ার গভর্নরকে বললেন সেই বৃদ্ধকে দেখাশোনা করার জন্য; কারণ, এটা তার কাজেরই অংশ। অধীনস্ত প্রজাদের আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে তিনি (রা.) খুবই সচেতন ছিলেন। একবার মিশরের গভর্নরকে তিনি তিরস্কার করেছিলেন এই বলে যে:

"আমরা আবার কবে থেকে জনগণকে দাসে পরিণত করলাম যখন কিনা তারা জন্মসূত্রে মুক্ত ও স্বাধীন?"

(চলবে)

শিখ ধর্মমত- কতিপয় বৈশিষ্ট্য

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

উত্তর-পশ্চিম ভারতের পঞ্চ নদের ভূমি পাঞ্জাবে শিখ ধর্মমতের উৎপত্তি। আধুনিক কালের ভারতের মানচিত্রে পাঞ্জাবকে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে বিভক্ত দেখা গেলেও শিখ মতবাদের উৎপত্তির সময়ে এ বিভক্তি ছিলনা এবং তখন মাত্র একটি পাঞ্জাব ছিল। শিখ মতবাদকে এক ব্যক্তির জীবনের চিন্তা, কার্যধারা এবং অভিজ্ঞতা সমূহের গৃহীত সিদ্ধান্ত হিসাবে বর্ণনা করা যায়। এটি ছিল গুরু নানকের জীবনের ঘটনা। ১৪৫৯ সনে শিখ গুরুদের প্রথম গুরু, গুরু নানক তালবন্দিতে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি নানকানা সাহেব নামে পরিচিত এবং পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরের প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সময়টি ছিল সুলতান বাহালুল লোধির আমলের (১৪৫১-১৪৮৯) তুলনামূলক শান্তি ও নিরাপত্তার এবং গুরু নানকের উদ্ভবের সময়টির সাথে বাহালুলের অধীন লোধি এবং তার পুত্র সিকান্দরার-এর কর্তৃত্বের সম-সাময়িক। মনে হয়, নানক শান্তি, আইনের শাসন, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এক যুগে জন্মে ছিলেন। তিনি তার পিতার গ্রামে বড় হন। কৈশোরে তিনি মাঝে মাঝে সুলতানপুর যেতেন, যেখানে তিনি পাঞ্জাবের গভর্নর দৌলত খান লোধির অধীনে চাকরি করতেন। সেখান থেকেই তিনি মাউন্ট সুমেরু, মক্কা, মদীনা, বাগদাদ এবং বুখারার মত জায়গা সমূহে ভ্রমণ শুরু করেন।

তিনি সিংহল কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানসহ ভারতের পানিপথ (শেখ শরফ), দিল্লী (সুলতান ইব্রাহীম লোধি), পাক পত্তন (শেখ ফরিদ ইব্রাহীম), সৈয়দপুর (বাবর) এবং মুলতানের পীর বাহাউদ্দিন ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে সাধারণত তিনি মারদানা, সাইদু, ঘেহো, হাসু, লোহার, এবং শিহানছিম্বা নামক তার ঘনিষ্ঠ সহচরদেরকে সাথে রাখতেন।

অনেক লেখক এ মর্মে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, গুরু নানক সন্যাসী ও হিন্দু-ধর্মীয় চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু গুরু নানকের দিকে একবার দৃষ্টি দিলে এটা সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান করতেন, মুসলমান কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন, মুসলমানদের পবিত্র স্থান সমূহে ভ্রমণ ও সেখানে ইবাদতে রত অবস্থায় কখনো চল্লিশ দিন পর্যন্ত এক দীর্ঘকাল ধ্যান-মগ্ন থাকতেন (মক্কা সফরের সময়ের সর্বোচ্চ সীমা) এবং তাঁর ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা ইসলামি শিক্ষা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। 'জনম সখি' পাঠেও এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে, গুরু নানক তাঁর সময়ের পীর ও সূফীদের সাথে অধিক সময় কাটাতেন এবং তাঁর শিক্ষা ও আমল ছিল ইসলাম ধর্মের অধিকতর নিকটবর্তী। এ বিষয়টি প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কর্তৃক রচিত পুস্তক 'সৎ বচন'-এ বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

'গুরু' শব্দটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। দুটি অংশ, -'গু' অর্থাৎ যিনি অজ্ঞতা ও অন্ধকারকে অদৃশ্য করেন, এবং 'রু'-এর অর্থ হচ্ছে, যিনি জ্ঞান দান করেন। যখন কেউ গুরু নানকের 'জনম সখি' পাঠ করবেন, তখন এ বিষয়টি প্রতিপন্ন করা সম্ভব হবে যে, গুরু নানক একজন সংস্কারক ছিলেন, যিনি কথায় ও কাজে জাত-প্রথার বিরোধী এবং নারী-জাতির মর্যাদার উন্নতির প্রয়াসী ছিলেন। সমভাবে কেউ একথাও বলতে পারে যে, তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় সমন্বয়কারী, যিনি হিন্দু মতবাদ ও ইসলামকে তাঁর নিজ ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে একত্রে মিশ্রিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন অথবা তিনি ছিলেন খাঁটি ধর্মের বিরুদ্ধে কুসংস্কার ও পরিবর্তনে বাধা দানকারী। গুরু নানকের অধিকতর সন্তোষজনক মূল্যায়ন হতে পারে সম্ভবত তাঁকে একজন মরমী ও সূফী হিসাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমেই, যিনি স্রষ্টার চরম একত্ব অনুধাবন করতে পেরে সর্বদা 'এক ও অদ্বিতীয়ের' অস্তিত্বের কথা বলতেন।

নিজেকে অনুসরণ করতে তিনি মানুষকে আহ্বান করেছিলেন কি-না, তা অনিশ্চিত এবং নির্ণয়ও অসম্ভব। তিনি চান নি যে, তাঁর অনুসারীদের এক সম্প্রদায় গড়ে উঠুক, বরং তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বার্তার সত্যতা প্রকাশ পাক, যা প্রতিষ্ঠা করতে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তথাপি একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা জরুরী হয়ে পড়লো, যারা এক স্বাধীন-ধর্ম হিসাবে এর নিজস্ব আনুষ্ঠানিকতা ও বৈশিষ্টসূচক রীতি-নীতি সহ আত্মপ্রকাশ করলো।

১৫২১ সনের দিকে, উত্তর ভারতে বাবরের আক্রমণের অব্যবহিত পরে গুরু নানক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি ঘুরে-বেড়ানো শিক্ষক-জীবনেরই ইতি টানবেন এবং কর্তারপুরে বসতি স্থাপন করবেন। তিনি তাঁর সূফীর পোশাক পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষের বেশ ধারণ করলেন এবং তাঁর চারপাশে জড়ো হওয়া লোকদেরকে শিক্ষাদান করা শুরু করলেন। তিনি বেদের ঐন্দ্রজালিক জাদু মন্ত্রের শিক্ষা, পূর্বপুরুষদের পূজা, জ্যোতিষী-বিদ্যা, শুভলক্ষণ-যুক্ত দিন সমূহ, এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের শাস্ত্রীয় আচারানুষ্ঠান বাতিল করলেন। তাঁর শিক্ষা ছিল খাঁটি এবং সহজ এবং এক অদ্বিতীয় সত্তার অধিকারী খোদার ধ্যান ও উপাসনা করা, যিনি বিশ্বের সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, যিনি সময় এবং মানব উপলব্ধির উর্ধ্বে অবস্থান করেও তাঁর দয়া দ্বারা মানবের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর ডাকে সাড়া দিতে আহ্বান করলেন। সৎ প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষ খোদার মত হয় এবং পরিণামে সে কালোত্তীর্ণ সত্তার সাথে মিলিত হয়। যদি সে এরূপ হতে না চায়, তবে সে

আধ্যাত্মিক মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়।

এর অনেক পরে নূতন নূতন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার প্রবর্তন করা হয়। ১৫২১ সনের সেপ্টেম্বরে যখন গুরু নানক মারা যান, শিখ ধর্ম তখন মাত্র ভ্রূণাবস্থায় ছিল। তিনি তাঁর শিক্ষার যা কিছু রেখে গেলেন, তা ছিল ৯৭৪টি স্তবগানে সংরক্ষিত, যার অনেকগুলিই লিখিতভাবে এবং মুখস্ত অবস্থায় প্রত্যহ ব্যবহার করা হতো। তাঁর শিষ্যের অনুগত একটি সম্প্রদায় ছিল, যারা স্বর্গীয় নামের ধ্যান করত এবং তাঁর রেখে যাওয়া শিষ্য গুরু অঙ্গদ এই ধর্মীয় দর্শনকে উন্নতি দান করে চললেন। গুরু অঙ্গদের পর অন্যান্য গুরুরা শিখ ধর্মীয় দর্শনকে বর্তমান অবস্থায় আনতে নূতন সব আনুষ্ঠানিকতা ও পদ্ধতি যোগ করে এর উন্নয়ন সাধন করতে থাকেন। স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রথম চারজন গুরু ছিলেন ক্ষত্রীয় গোত্রের জন্মগত হিন্দু, যারা শিখ-ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরিণামে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতে শিখ ধর্মের শিক্ষা, আনুষ্ঠানিকতা ও পদ্ধতি সমূহে শিখদের দৈনন্দিন জীবনে হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রবেশ করান। যেসব কারণ শিখ ধর্মকে আজকের অবস্থায় আনতে সাহায্য করেছে, ওগুলো প্রতিষ্ঠা করতে ইতিহাসের প্রচার প্রয়োজন। ভারতে মোগল বাদশাহদের সাথে শিখদের বিরোধ এক নূতন এবং সংগ্রামশীল গোত্র হিসাবে পাগড়ী এবং শিখ গোত্রের অন্যান্য বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে সজ্জিত করে। নানক কর্তৃক সমন্বয়কৃত শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় মতবাদ ক্রমশঃ এক সংগ্রামশীল সংঘ রূপে প্রকাশিত হয়, যা দশম গুরু, গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৬৬-১৭০৮) কর্তৃক চূড়ান্ত ভাবে সজ্জিত হয় এবং আমরা যেভাবে জানি, গোবিন্দ শিং এর আমলেই আজকের শিখ মতবাদ পূর্ণভাবে গঠিত হয়।

১৫০০ থেকে ১৭০৮ সনের মধ্যে শিখদের দশ জন গুরু অতিবাহিত হয়, যাদের সর্বশেষ গুরু হচ্ছেন গুরু গোবিন্দ সিং। শিখদের জন্য তার গুরু-গিরি অনেক গুরুত্ব বহন করে। তিনি খালসা (পবিত্রজন)-দের এক নূতন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেন এবং তাদেরকে পাঁচটি বৈশিষ্টসূচক প্রতীক - অকর্তিত কেশ, একটি ঝুঁটি, একটি ইস্পাতের কব্জিবন্ধ, একটি তরবারি এবং খাটো পাজামা, অতঃপর সদ্যব্রত গ্রহণকারী এই শিখকে 'সিং' (সিংহ) উপাধি দেওয়া হয় এবং মহিলাদেরকে 'কাউর' (রাজকুমারী) নাম ধারণ করিয়ে 'খালসায়' ভর্তি করানো হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি 'পাঁচ পেয়ারে' (পাঁচজন অতিপ্রিয়) প্রতিষ্ঠা করেন, পাঁচ-এর একজনকে ক্ষত্রীয় গোত্র থেকে, আরেকজনকে জাট গোত্র থেকে এবং বাকী তিন জনকে শূদ্র গোত্র থেকে নিয়ে শিখ-দর্শনে বর্ণ ভেদ প্রথা ও লিঙ্গ-বৈষম্যে সমতা-বিধান করা হয়েছে। শিখ ধর্মমতের অন্যতম জাদুকরি ক্রম-বিকাশী দৃষ্টিভঙ্গী হলো সেই প্রক্রিয়া, যা এক মানব গুরু দিয়ে আরম্ভ হয়ে বর্তমান অবস্থায় শেষ হয়েছে সেখানে, যেখানে শিখ ধর্মগ্রন্থ সমূহের পূর্ণ কর্তৃত্ব বিরাজমান। শিখ ধর্মগ্রন্থ সমূহের দু'টি প্রচলিত নাম রয়েছে,–'আদি গ্রন্থ' এবং 'গুরু গ্রন্থ সাহেব'। প্রথম নামকরণটি হচ্ছে প্রাচীন। 'গ্রন্থ' বলতে এর সাধারণ অর্থ হলো সংগ্রহ, সঙ্কলন-গ্রন্থ বা বই। 'আদি' শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রথম–এটা শুধু দশম গুরুর লেখা গ্রন্থ 'দশম গ্রন্থ' এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহের থেকে নিজের স্বাতন্ত্রই প্রকাশ করে না, বরং নিজ অনন্যতাও তুলে ধরে। উদাহরণ স্বরূপ-গুরু নানক হল 'পহলে গুরু' (প্রথম গুরু), এবং 'আদি গুরু' হলেন 'খোদা'।

'গুরু গ্রন্থ সাহেব'-এর উৎপত্তির মূল হচ্ছে গুরু নানকের স্তবগান সমূহ। তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থ হিসেবে ওগুলোর অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু তাঁর পরবর্তী গুরুদের আমলে ওগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। 'ভাই গুরুদাস' (চতুর্থ গুরু রাম দাসের চাচাত ভাই পঞ্চম গুরু অর্জুনের আমলের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ) বর্ণনা করেন যে, গুরু নানক মক্কা সফর করেন 'তিনি হাতে একটি লাঠি' বগলে একটা বই এবং একটা পানির পাত্র ও আযান দেয়ার জন্য জায়নামায বহন করেছিলেন'। (১ম সংস্করণ, স্তবগান-৩২) এ বিষয়ে ইতিহাসে অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে, যা থেকে পাঠকগণ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

'গুরু গ্রন্থ সাহেব' কবিতাকারে লিখিত এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ সমূহের মধ্যকার বিষয়বস্তু এবং অ-শিখ বিষয়বস্তুর স্তুতিগান অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও এটা অদ্বিতীয়। 'ভগথ বাণী' নামক গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলিম লেখকদের লেখা এতে সন্নিবেশ করা আছে। পাঞ্জাবী ভাষায় 'গ্রন্থ সাহেব' রচিত হয়েছে, যাকে 'গুরু মুখী' বলা হয়। সেখানে স্তবগানের যে বিন্যাস রয়েছে, তা হলো ঃ গুরু নানক-৯৭৪, গুরু অঙ্গদ-৬২, গুরু আমির দাস-৯০৭, গুরু রামদাস-৬৭৯, গুরু অর্জুন-২২১৮, গুরু তেগ বাহাদুর-১১৬, কবির-৫৪১, ফরিদ-১১৬, নামদেব-৬০ এবং রবি দাস-৪১। শেখ ফরিদ নামের একজন সূফী-সাধকের ১৩৪টি স্তবগাণও 'গুরু গ্রন্থ সাহেব'-এ দেখা যায়। সম্ভবতঃ ওগুলো পাঞ্জাবের পাকপত্তনের চিশ্‌তি-রীতির প্রধান অথবা তার শিষ্যদের দ্বারা করা হয়েছে। গুরু নানক যে সময়ে সেখানে গিয়েছিলেন অবশ্যই 'ফরিদ' তখন পাক পত্তনের পীর ছিলেন।

'গুরুদোয়ারা' (শিখদের উপাসনার স্থান) হলো শিখদের উপস্থিতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক চিহ্নিত স্থান বিশেষ। এটা হতে পারে এক জাঁকালো সাদা সুসজ্জিত এবং অন্যান্য দালান অপেক্ষা উঁচু ইমারত, অথবা এক সমতল-ছাদ বিশিষ্ট দালান। যুক্তরাজ্যে এটা হতে পারে এক সাদামাটা চত্বর-যুক্ত বাড়ী। সঠিক ভাবে বলতে গেলে 'গুরুদোয়ারা' হলো এমন এক স্থান, যেখানে 'গুরু গ্রন্থ সাহেব'-এর একটা অনুলিপি স্থাপন করা থাকে। গুরুদোয়ারা-এর অদ্বিতীয় ও পার্থক্যকারী স্থায়ী একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে 'নিশান সহ যে-কোন পর্যটককে, তা শিখ হোক অথবা না হোক, একথা জানিয়ে দেয় যে, সেখানে আতিথেয়তা পাওয়া যাবে।

গুরুদুয়ারা গুলোকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো গোত্রীয়, যেটা শিখদের দৈনন্দিন ধর্মীয় প্রয়োজনাদি মিটানোর জন্যে তৈরী করা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয়টি

ঐতিহাসিক গুরুদুয়ারা হিসেবে সমধিক খ্যাত, যেমন–দিল্লীর শিশগঞ্জের গুরুদুয়ারা, এটা সে-স্থানে অবস্থিত, যেখানে গুরু তেগ বাহাদুর নিহত হয়েছিলেন এবং আনন্দপুরের কাশগড়ের গুরুদুয়ারা, এই গুরুদুয়ারা সে-স্থানে অবস্থিত, যেখানে গুরু গোবিন্দসিং 'খালসা' প্রবর্তন করেন। শিখদের ধর্মীয় কর্তৃত্ব পালনের জন্য ৪টি আসন রয়েছে, সেগুলো হচ্ছেঃ- শ্রী আকাল তখ্‌ত সাহেব (দরবার সাহেব), অমৃতসর তখ্‌ত সিড়ি পাটনা সাহেব, পাটনা তখ্‌ত সিড়ি কেশগড় সাহেব এবং আনন্দপুর তখ্‌ত সিড়ি হুযূর সাহেব, নান্দের।

স্বাভাবিক ভাবে গুরুদুয়ারার নির্মান-শৈলী হলো সম্রাট শাহজাহানের মুঘল রীতিতে, গাথুঁনিতে ইট অথবা পাথর, যা-ই ব্যবহার হোক না কেন, উপরের শেষ আস্তরণটা হয় সাধারণত সাদায়। গুরুদুয়ারা গুলোতে স্কুলের কাজও চালানো হয়ে থাকে, যেখানে শিশুদেরকে শিখ মতবাদের মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয় এবং পরিব্রাজকদের বিশ্রামের স্থান হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাবার প্রস্তুত করার জন্য ওগুলোতে রন্ধনশালা রয়েছে এবং কখনো ওগুলো চিকিৎসাগার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। যাহোক, গুরুদুয়ারার প্রাথমিক ও প্রধান কাজ হচ্ছে সেখানে প্রার্থনা করা হয় এবং যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এর প্রধান কক্ষটিতে স্থাপন করা আছে 'গ্রন্থ সাহেব' এবং সেই কক্ষটিতে সম্প্রদায় বিচার-কাজ করার জন্য একত্রিত হয়ে থাকে। গ্রন্থটিই হচ্ছে এই কক্ষের কেন্দ্রবিন্দু, যা একটি তখ্‌ত বা পাল্কি নামক কাঠের কাঠামোর ভিতরে চাঁদোয়ার নীচে একটি তাকিয়া-র উপর স্থাপিত। যে কোন সময়ে এখানে প্রার্থনা করা যায় এবং তাতে কোন নির্দিষ্ট সদস্য-সংখ্যার উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। শিখদের জন্য এখানে প্রত্যুষে অথবা বিশেষ করে সন্ধ্যায় সমষ্টিগত ভাবে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করা একটি সাধারণ ব্যাপার। কর্তারপুরের গুরু নানকের সম্প্রদায়ের লোকদের ঐতিহ্যের এটি একটি অংশ।

সকাল অথবা বিকাল, যখনই হোক, গুরুদুয়ারায় যাবার আগে গোসল করতে হয়। মসজিদে ঢুকার আগে যেভাবে জুতা খুলতে হয়, ঠিক সেভাবেই গুরুদুয়ারায় ঢুকার আগে জুতা খুলে পা ধুতে হয়। পুরুষ মহিলাদেরকে গুরুদুয়ারায় ঢুকার আগে অবশ্যই তাদের মাথা ঢাকতে হয় এবং ঢুকার পর আলাদা আলাদা আসন গ্রহণ করতে হয়। 'গ্রন্থ সাহেব' খোলার মাধ্যমে যে কোন পুরুষ অথবা মহিলা, যিনি সেটা পাঠ করতে পারেন, তার দ্বারা প্রার্থনার কাজ শুরু হয়। শিখ মতবাদে পৌরহিত্য অথবা ভারপ্রাপ্ত যাজক নেই, বা কোন সাধারণ মানুষ গুরুদের স্থান দখল অথবা গ্রন্থসাহেবের পরিবর্তে ভিন্ন কিছু গ্রহণ করতে পারে না। কতিপয় গুরুদুয়ারায় 'গ্রন্থি' বলে কথিত বেতন প্রাপ্ত কোন লোককে দিয়ে গ্রন্থ পাঠ, সেবা অথবা বিবাহের মত উৎসব পরিচালনা করানো হয়ে থাকে, কিন্তু তার ভূমিকা হচ্ছে কেবলই আনুষ্ঠানিক। সে হচ্ছে সম্প্রদায়টির এক সেবক মাত্র এবং তার মর্যাদা কোন পুরোহিত অথবা ভারপ্রাপ্ত যাজকের মর্যাদার সমতুল্য নয়।

এই ধর্মমতের আরও কয়েকটি দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো–

খোদা সম্পর্কিত ধারণা ঃ 'খোদা এক, একক ও অদ্বিতীয় সত্ত্বা'। 'আদি গ্রন্থ'তে ধারণকৃত এটাই হচ্ছে পুনরাবৃত পর্যবেক্ষণ। কেউ সহজেই একথা বলতে পারে যে, আদি গ্রন্থের প্রধান বিষয় হচ্ছে খোদার মহিমা এবং গুণাবলীর বর্ণনা। ফলে শিখমতবাদকে আপোষহীনভাবে একেশ্বরবাদ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। যেভাবে আগেই বলা হয়েছে, গুরু নানক এক অস্থাবর খোদায় বিশ্বাস করতেন, যার উপাসনা তিনি করতেন এবং যাকে তিনি ভালবাসতেন। বাবা নানকের প্রথম কাব্যিক উচ্চারণ, যা 'মূলমন্ত্র' (মৌলিক কাব্যগাথা) নামে পরিচিত, উহা শিখধর্মবিশ্বাসকে সংক্ষেপে প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়েছে ঃ খোদা এক। তাঁর নামই চিরন্তন সত্য। তিনি সর্বস্রষ্টা এবং সর্বব্যপ্ত আত্মা। তিনি ভয়শূন্য এবং ঘৃণা বিহীন, কালোত্তীর্ণ এবং নিরাকার। তিনি জন্ম ও মৃত্যুর উর্দ্ধে এবং স্ব-আলোকিত।

গুরু নানকের মতে, খোদা সম্বন্ধে ভীত হওয়া কোন মানুষের পক্ষেই উচিত নয় কিন্তু তাঁর মহিমার প্রতি সম্ভ্রমবোধ রাখা উচিত। খোদা ছাড়া অন্য কারো ভয়ে ভীত হওয়া বৃথা; অন্য সব ভয় হলো মনের মায়ামূর্তি'। একজন খোদা ভীরু লোক, যে সৎ পথে চলে, খোদার নৈকট্য লাভ করার কারণে সে দেখতে পাবে যে, তার ভয়গুলো তিরোহিত হয়ে গেছে। 'গুরু সেবকরা প্রভুর সন্তুষ্টির পাত্র হয়ে থাকেন। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং এতে তারা মৃত্যুকে আর কখনো ভয় পায় না। প্রভু ঐসব লোকদের সন্দেহ মিটিয়ে দেন যারা তাঁকে ভালোবাসে এবং তিনি তাদেরকে নিজের সাথে একত্রিত করেন। প্রভু ভীতি থেকে মুক্ত, সীমাহীন এবং অশেষ। তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং সত্যের প্রতি সন্তুষ্ট'।

যে কোন শিখ মতবাদের আরম্ভস্থল হচ্ছে মানুষ, আর সে-বিষয়ক বয়ান হলো 'তাঁর ইচ্ছাতেই সব আকারের মানুষ অস্তিত্ব লাভ করেছে। একটি ক্রম-বিবর্তনের ধারায় মানুষই একমাত্র সর্বাধুনিক অথবা সর্বোচ্চ ফসল নয় অথবা সে কোন দুর্ঘটনার ফলও নয় কিন্তু সে আবার খোদার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিণতিও বটে। শিখ মতবাদ একথা জোর দিয়ে বলে যে, মানব অস্তিত্বই উত্তম, কারণ মানুষই হচ্ছে এ বিষয়ে অদ্বিতীয় যে, সৃষ্টি-সমূহের মধ্যে সে একাই প্রভেদ-বোধের অধিকারী এবং নিজের মধ্যেই সে এক স্বর্গীয় ঝলক বহন করে।

'হে আমার আত্মা, তুমি খোদার জ্যোতি থেকে নির্গত হয়েছো, তুমি তোমার সত্যিকার উপাদান জেনে নাও'।

মানুষ বুদ্ধিমান, সে সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে সক্ষম, অন্তরে তার নৈতিক-আইন লিপিবদ্ধ আছে, তথাপি সে সৎকর্ম করার সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। এ বিষয়টি গুরু নানক সহজ কথায় এভাবে প্রকাশ করেছেন–'একজন ঠিক ততোটুকুই পায়, যতটুকু কর্ম সে করে থাকে। কর্ম যেমন, তার ফলও ঠিক তেমনই'। তথাপি সব বদান্যতা খোদার কাছ থেকেই আসে। 'অধিকার-বল'-এ কেউ সেগুলো দাবী করতে পারে না, আবার অনেককেই তিনি

আশিস-মন্ডিত করার জন্য জাগিয়ে তোলেন'। তাঁর দয়া ছাড়া কিছুই লাভ করা যায় না (এখানে নজর বা দর্শন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। পুনরায় 'সৎকাজ দ্বারা উন্নততর অস্তিত্ব লাভ করা যায়, কিন্তু স্বাধীনতা কেবলমাত্র তাঁর দয়ার মাধ্যমেই আসে' এবং চতুরতার মাধ্যমে খোদাকে বুঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না'। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারাই, যা খোদা থেকে আসে, দয়ার সোপান (খরম খন্দ) লাভ করা সম্ভব। দয়া লাভের জন্য প্রিয় খোদা স্বেচ্ছায় সাহায্য করে থাকেন, 'যদি কেউ তাঁর দিকে এক কদম এগোয়, তিনি (খোদা) তার দিকে হাজার কদম অগ্রসর হন' (বড় ভাই গুরুদাস)।

মায়া ঃ –শিখ মতবাদ সৃষ্ট-বিশ্বাসের বাস্তবতায় বিশ্বাস করে। এটা বিশ্বকে গ্রহণ ও ঐকান্তিক ভাবে সম্মান করে, কারণ এটা খোদার সৃষ্টি। অতএব বিশ্ব মানুষের প্রয়োজন ও ভোগের জন্য বিদ্যমান রয়েছে, এটা পরিত্যাজ্য অথবা মন্দ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। 'মায়া' হচ্ছে সেই শব্দ যা বৃহত্তর অর্থে পার্থিব জগতের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়। 'মায়া' শব্দের অনুবাদে সম্পদ বা প্রকৃতি অথবা তাদের প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যায়। 'তাঁর লুক্কায়িত অসীম শক্তির মাধ্যমে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। খোদা ত্রিভূবন ও উহাদের বন্ধনের উপকরণ হিসেবে মায়া সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন এবং নিজেই ধ্বংস করেন'।

মায়ার প্রতি আসক্তি খোদার প্রতি আসক্তি দ্বারা বদল করে নাও। শিখ মতবাদ হিন্দুদের থেকে এজন্য আলাদা যে, এটা দৃঢ়ভাবে বলে যে, দৈনন্দিনের জীবন-যাপন এবং 'গার্হস্থে' অংশ গ্রহণেই আসল মুক্তি অর্জন করা যায়। নিখিল সৃষ্টিতে খোদা সর্বদা সক্রিয় আছেন এবং সবার মধ্যে উপস্থিত এবং বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান হিসেবে বিদ্যমান আছেন। পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে কথা বলা-ই হচ্ছে 'গুরু' বা 'খোদা'র কর্তব্য। চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করতে একজনকে অবশ্যই প্রার্থনায় নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন এবং স্বার্থপরতা ত্যাগ করে খোদা-ভীরুতা অর্জনকারী হতে হবে। সে যা-কিছুই করবে, তা হতে হবে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এই নিয়মানুবর্তিতা পালন করা কোন সহজ কাজ নয়, কিন্তু প্রত্যেক শিখকে এটা অর্জনের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করা উচিত। গুরু নানক যেভাবে বলেছেন, 'প্রার্থনা দ্বারা আমি বেঁচে থাকি, এটা ব্যতিরেকে আমি মরে যাই। সত্য-সত্ত্বার নাম অর্চনা করা এক কঠিন কাজ'।

খোদা এই ধরাধামে অবতরন করে মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণীর দেহধারণ করেন-এ মতবাদকে শিখরা বাতিল করে। ওহী সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে–খোদা অবিরতভাবে নিজেকে প্রকাশ করছেন। যেহেতু খোদা এক এবং অদ্বিতীয়, যার উপর সবকিছুর সৃষ্টি নির্ভর করে, তিনি অবশ্যই অবিরত ভাবে ক্রিয়াশীল। তাঁর বদান্যতা এতই মহান যে, দাতা দান করে চলেছেন, কিন্তু গ্রহীতা উহা গ্রহণ করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেবল বর্তমানেই নয়, বরং সব সময়েই মানুষ তাঁর বদান্যতার ছায়ায় বাস করে আসছে'। একই ভাবে মানুষও সর্বদাই ব্যক্তিগত ভাবে যোগযোগ রাখছে, যেমন– নবী-মূসা, যীশু, মুহাম্মদ এবং গুরু-এদের মাধ্যমে খোদার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছে। এ কারণে শিখরা 'পুনরায় দেহধারণ'-এর বিশ্বাসকে বাতিল করে। তারা নবীগণকে মানব হিসেবে গণ্য করে, যাদের আগমনকে বিশ্বের হেদায়েতের জন্য খোদা পছন্দ করে থাকেন।

প্রার্থনা–শিখ মতবাদে ধ্যান করা যদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি প্রার্থনাও শিখদের ইবাদতের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে 'আর্যাস'। যদিও হিন্দু পন্ডিতগণ এর উৎপত্তিতে মূল শব্দ 'আর্যদাস্ত', যার অর্থ হচ্ছে, আবেদন অথবা সম্বোধন, যা কোন অধীনস্ত কর্তৃক তার উর্ধতনের কাছে পেশ করা হয়। জমায়েতটি শ্রদ্ধা ও অবনমিতার চিহ্নস্বরূপ গুরুগ্রন্থ সাহেবের আসনাভিমুখে নিবেদন করা হয়। যে কোন সামাজিক মর্যাদার নারী অথবা পুরুষ তখন এগিয়ে এসে সমাবেশের পক্ষ থেকে প্রার্থনা উৎসর্গ করেন। প্রার্থনার তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথমে শিখদেরকে খোদা এবং গুরুদের জপগাঁথা করতে বলা হয়। তারপর উক্ত সমাবেশকে খোদার বাক্যের ভান্ডার 'গুরু গ্রন্থ সাহেব'কে হেদায়াতের প্রকাশিত আকার রূপে স্মরণ রাখতে বলা হয়।

এরপর, 'আর্যাস' এর চূড়ান্ত অধ্যায় হলো সনির্বন্ধ আবেদন পেশ করা,–'খালসা'কে বিশ্বস্ত রাখা, সমগ্র মানবজাতিকে মহিমান্বিত করা এবং রুগ্ন, শোক-সন্তপ্ত ও নব বিবাহিতদের জন্য খোদার সমীপে ব্যক্তিগত প্রার্থনা করা।

সংক্ষেপে, শিখ ধর্ম-নীতি তিনটি মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হচ্ছে 'কীর্তি করো, নাম জপো এবং ভান্দ খাও, অর্থাৎ-কর্ম, প্রার্থনা ও বদান্যতা একজন মানুষের সারা জীবনে প্রভুত্ব করুক। গুরু নানক সংক্ষেপে বলেনঃ –'শহর এবং প্রধান জনপদের কাছে যেখানেই বাস করো, কিন্তু সতর্ক থাকবে। প্রতিবেশীর সম্পত্তির প্রতি লালসা করবে না। তাঁর নাম ছাড়া আমরা অভ্যন্তরিন শান্তি লাভ করা, এমনকি মনের ক্ষুধাও মিটাতে পারিনা। আমাদেরকে অবশ্যই সত্য-কে পূঁজি করে খাবারে ও নিদ্রায় মধ্যপন্থি হতে হবে। এটাই হচ্ছে আসল জীবন'।

[রিভিউ অব রিলিজিউন্স, নভেম্বর, ১৯৯৪ অবলম্বনে]

২৬শে মার্চ

"স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস"

উপলক্ষে আমরা

গভীর ভাবে শ্রদ্ধা জানাই

সেই সব বীর শহীদ ও

বীর সৈনিকদের যারা

এ দেশের জন্য প্রাণ

দিয়েছেন এবং লড়েছেন।

ডাকার মত ডাকলে আল্লাহ্ অবশ্যই সাড়া দেন

সরফরাজ এম.এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

পবিত্র কুরআন করীমের সূরা বাকারার তফসীর গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব বলেছেন যে, "মির্যা বশির উদ্দীন সাহেব কুরআন মজীদের ইংরেজি অনুবাদে আখেরাত শব্দের অর্থ করেছেন 'পরবর্তী ওহী' অর্থাৎ তাঁর পিতা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের উপর "যেসব ওহী নাযেল হয়েছে তাতেও ঈমান রাখতে হবে। এই দাবীর কোনও দলিল পেশ করতে পারেন নি। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, হযরতের পরবর্তী সময়ে কোনও নবী আসবেন না। ফলতঃ কারও প্রতি কোনও ওহী নাযিল হবে না"। অর্থাৎ আল্লাহ্ আর কথা বলবেন না।

বড় বড় ডিগ্রীধারী আলেম ওলেমা মুফতী মাওলানাগণ তাই বই পুস্তকে আবু দাউদ দ্বিতীয় খন্ডের হাদীস উল্লেখ করে বলে থাকেন যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন করে মোজাদ্দেদ প্রেরণ করবেন, যিনি এসে ধর্মের সংস্কার সাধন করবেন"। "যামানার সেই মোজাদ্দেদ বা ইমামকে না মেনে যার মৃত্যু হবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের।" (মসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও সহী মুসলিম) বুঝা গেল যে, যামানার ইমামকে না মেনে যার মৃত্যু হবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের। তিনি যত বড় আলেম ওলামা, মুফতী মাওলানা, নামাযী, রোযাদার হজ্বব্রত পালনকারী এবং যত পরহেজগারীই দেখান না কেন আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তা গৃহীত হবে না, তার মৃত্যু হবে অজ্ঞতার।

"আমাদের একমাত্র দরকার কুরআন হাদীসের শিক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং তা দ্রুততার সাথে কার্যে পরিণত করে আদর্শ মুসলমান হওয়া আর এই কার্যের ভারই প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে মোজাদ্দেদগণের উপর সমর্পিত হয়েছে। ইসলাম সৌধের উপর শতাব্দীকালের রথচক্রে যেসকল আবর্জনারাশি পতিত হয়ে যায় এবং তাতে নবীগণ রূপ অমল ধবল, শুভ্র, প্রস্তর খন্ডের জ্যোতিকে দুনিয়া আলোকিত করবার জন্য আবদ্ধ করে রাখে, আর দূরীভূত করে অপশক্তি যাতে ইসলাম সৌধের জ্যোতি পুণরায় ধরাকে প্লাবিত করতে পারে, এটাই প্রত্যেক মোজাদ্দেদ বা ধর্ম সংস্কারকের কর্তব্য। ধর্মের যে সকল শিক্ষা কুরআন ও হাদীসের কালের কবলে পতিত হয়ে বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যায় বা যে সকল ভুল ভ্রান্তি বা কুসংস্কার জড়িত রীতিনীতি ধর্মনীতি বলে কুখ্যাত হয় তা দূরীভূত করা মোজাদ্দেদের কর্তব্য। উপরন্তু তিনি ধর্মের বিমল জ্যোতিকে বিচ্ছুরিত করে ধর্মের অনুপম শিক্ষায় জগৎবাসীকে সত্য ধর্মের দিকে আকর্ষণ করবেন–এটা তাঁর একান্ত কর্তব্য (আলহাজ্জ মাওলানা ফজলুল করীম এম. এ. বি. এল রচিত মানবধর্ম ৮৪ পৃষ্ঠা এবং আবুল হাসেম রচিত ইসলামের মর্মবাণী)। এখানে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এত আলেম ওলামা মুফতী মাওলানা পীর মুর্শিদগণ থাকতে আবার মুজাদ্দেদের প্রয়োজনটা কি? এমন নয় যে, আলেম ওলামা মুফতী মাওলানা সাহেবানদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বরং দিন দিন বেড়েই চলছে। তা সত্ত্বেও মোজাদ্দেদের প্রয়োজন কী? নিশ্চয়ই তারা ভুল-ভ্রান্তিতে পতিত হয়ে কুসংস্কারে জড়িত রীতিনীতিকে ধর্মীয় নীতি বলে নিজেরা বিশ্বাস করবেন এবং তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করবে।

একথা সম্ভবত কারো অজানা নেই যে, বিগত তেরশত শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ.) বর্তমানে চৌদ্দশত শতাব্দি পার হয়ে পনেরশত শতাব্দীর বত্রিশ বছর চলছে। প্রশ্ন এই যে, চৌদ্দশত শতাব্দীর মোজাদ্দেদ কে? এবং তিনি কোথায়?

আমরা জানি, চৌদ্দ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ব্যতীত আর কেউই নন। তিনি আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি ও জগৎগুরু মানব মুকুট হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চৌদ্দশত শতাব্দীর মোজাদ্দেদ এবং আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবী করেন। তাঁর দাবীর সত্যতার সমর্থনে আসমান জমিন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, জলবায়ু সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করেছে। তাঁর দাবীর একশত বছর পার হয়ে গেছে। যদি তিনি মিথ্যা হতেন তাহলে খোদা তাআলা অবশ্যই তাঁকে পাকড়াও করবেন, যেভাবে কুরআনে বর্ণিত আছে, "আর যদি সে আমার নাম নিয়ে মিথ্যা রচনা করে বলতো, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই তাকে ডান হাতে ধরতাম এবং তার প্রাণ শিরা কেটে দিতাম।" (সূরা আল হাক্ক)

তাঁরই প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আহমদী জামা'তের সদস্যগণই নিজেদের ধন-সম্পদ এ জীবনযোগে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে নিয়োজিত হয়ে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের দ্বারা হযরত রাসূল করীম (সা.)-কে বিশ্ব নবী রূপে প্রতিষ্ঠা করার কাজে দিবা নিশি মত্ত। তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের ফলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে তাদের জীবনকে ধন্য মনে করছে। তাঁকে মেনে নেওয়া মুসলমান জাতির ঈমানী দায়িত্ব। তাঁকে মান্য করা গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের যে কেউ ইমাম মাহদীকে পাইবে তাঁর উপর ইমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিবে।" (কনযুল উম্মাল) "যখন তোমরা তাকে দেখতে পাবে তার হাতে বয়আত করিও যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়।" (শুনানে ইবনে মাজা) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব যে কতটুকু হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র বাণী থেকে তা অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। ঈমান ও আমল খাঁটি মুসলমান হওয়ার লক্ষণ। আমল না থাকলে যেমন ঈমানের কোন মূল্য নেই তেমনি ঈমান না থাকলে আমল অনন্ত মরুভূমিতে বৃক্ষ রোপন করে তাতে জল সেঞ্চন করার

ন্যায় অর্থহীন। মুসলমান জাতির আজ আত্মীক, নৈতিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিক দিয়ে যে চরম অধ:পতন একথা আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন রাখে না। মুসলমানগণ নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জব্রত পালন করে, তবুও এই জাতির অধ:পতন কেন? তা ঈমানহীন আমলের কারণে নয় কী? নাই একতা, নাই ভ্রাতৃত্ববোধ, নাই পরস্পর সহানুভূতি, নাই কোন নেতা। এই শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমান জাতিকে একতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা ও মানবতার উচ্চাসনে উন্নীত করে মুসলমান জাতির হারিয়ে যাওয়া অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যথাসময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে নেতাবিহীন দলে দলে শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমান জাতিকে ঐক্যের ডাক দিলেন। তাঁকে মান্য করা আল্লাহ্ ও রাসূল করীম (সা.)-এর কঠোর নির্দেশ। তাঁকে অমান্য ও অস্বীকার করলে হযরত রাসূল করীম (সা.)-কে অমান্য ও অস্বীকার করা হয়। তাঁর প্রতি নাযিলকৃত ওহী ইলহামের প্রতি ঈমান না রাখলে, অমান্য ও অস্বীকার করলে হযরত রাসূল করীম (সা.)-কে অমান্য ও অস্বীকার করা হবে। অতএব হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) একথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

অত্র সূরা বাকারার ১৮৬ আয়াতের ব্যাখ্যা মাওলানা সাহেব নিজেই করেছেন যে, "আর (হে রাসূল) আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেসা করে (বলে দিও) আমি তো নিকটেই আছি, কোন আহবানকারী আমাকে ডাক দিলে, অমনি আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারা আমার ডাকে সাড়া দিতে থাকুক, আর আমার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করুক। সেমতে তারা (তত্ত্ব) জ্ঞান লাভ করতে পারবে।" উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বান্দাগণ যখন তাঁকে ডাকে অমনি আল্লাহ্ তাআলা তাদের ডাকে সাড়া দেন। প্রশ্ন এই যে, তিনি কিরূপে তাদের ডাকে সাড়া দেন? ওহী-ইলহামের মাধ্যমে নয় কী? বান্দাগণও যেন আল্লাহ্ তাআলার ডাকে সাড়া দেয়। অর্থাৎ অধ:পতিত মানবজাতিকে উদ্ধার কল্পে যখনই কোন নবী রাসূল প্রেরিত হয় তখন বান্দাগণও যেন তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। যাতে তারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সত্য সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পারে।

"খোদা তাআলা কখনো কখনো সাক্ষাৎভাবে (বা মুখোমুখী) কথা বলেন, এই সকল লোক নবী হয়ে থাকেন এবং কখনো তাদের কোন কোন পূর্ণ অনুসারীর সাথেও এইরূপে কথা বলেন এবং যখন কারও সাথে অধিক পরিমাণে এইরূপে কথা বলেন তখন ঐ ব্যক্তিকেই 'মোহাদ্দাস' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।" (মকতুবাতে ইমাম রাব্বানী আলফেসানী, মকতুব ৫২ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা) "আমার পরে ওহী নাই এটা মিথ্যা এবং হযরত নবী করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর জিবরাঈল পৃথিবীর দিকে নাযিল হবেন না বলে যে কথা প্রচলিত আছে এর কোন ভিত্তি নেই" (রুহুল মায়ানী ৭ম খন্ড ৬৫ পৃ:)

পরম দয়াময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাগণেকে শয়তানের মোকাবেলা করার জন্য অস্ত্র সরবরাহ করে নিম্নবর্ণিত ভাষায় তাদেরকে শান্তনা দিয়েছেন যে, "আমার তরফ থেকে অবশ্য আসবে তোমাদের জন্য হেদায়াত (নবী) যারা আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের জন্য না কোন ভয়-ডর আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে।"

হে "বনি আদম সন্তানগণ! যখন তোমাদেরই মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য কোন নবী আসেন এবং তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তখন তাঁর অনুসরণ করো। যারা পরহেজগারী অবলম্বন করবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে তাদের জন্য কোন চিন্তা ও ভয়ের কোন কারণ নেই।" (সূরা আরাফ) আদম সন্তানগণের শয়তানের দ্বারা দুনিয়াতে ভয় এবং আখেরাতে চিন্তার যে সম্ভাবনা ছিল আল্লাহ্ তাআলা এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে তা দূর করে দিয়েছেন। হযরত রাসূল করীম (সা.) পরিপূর্ণ শেষ শরীয়তধারী নবী। তাঁর পরে শরিয়তধারী নবীর আগমন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পাপের স্রোত বন্ধ হয়ে যায় নি। এই অবস্থায় হযরত রাসূল করীম (সা.)-কে অনুসরণ করে, তাতে বিলীন হয়ে সংস্কারক হিসেবে উম্মতি নবীর আগমন হবে বলে কুরআন করীমের বহু জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেছেন। "ওহী ব্যতীত আল্লাহ্ নশ্বর মানবের সাথে কথা বলেন না, অথবা পর্দার আড়াল হতে, অথবা তিনি রাসূল প্রেরণ করেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তার উপর অবতীর্ণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা শুরা) "নিশ্চয়ই আমাদের থেকে আসবে বাণী। যারা আমার বাণী অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।" (সূরা বাকারা) "তিনি গুপ্ততত্ত্বের অধিকারী। তিনি যাকে নবী বলে মনোনীত করেছেন তদ্ব্যতীত অন্য কারো নিকট ইহা প্রকাশ করেন নাই।" (সূরা জ্বীন)

সমগ্র সৃষ্টিরাজী নিয়ে আল্লাহ্ তাআলার পরিবার। সেই পরিবারের মালিক তিনি। তাঁকে ডাকলে যদি তিনি সেই ডাকের উত্তর না দেন, কথা না বলেন তাহলে এতো ডাকাডাকি হাকাহাকির স্বার্থকতা কি? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা বান্দার ডাক শুনেন এবং তার উত্তর দিয়ে থাকেন এবং কথা বলেন। কিন্তু ডাকার মতো ডাকতে হবে। বধিরগণই তার কথা শুনতে পায় না। এটা পবিত্র কুরআন করীমের কথা। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা প্রতি যুগে যুগে এ ধরাধামে এক একজন প্রেরিত মহাপুরুষকে আবির্ভূত করেন। যিনি এসে বধিরজনকে শ্রবণশক্তি দিয়ে, বোবার মুখে বাণী ফুটিয়ে, অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি দিয়ে, মৃত দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে জীবন্ত করে তুলেন। বর্তমান এই অধ:পতনের যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে আল্লাহ্ তাআলা ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তাঁকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই মুসলমান জাতির আত্মিক, নৈতিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র পথ। দ্বিতীয় আর কোন পথ তাদের জন্য খোলা নেই।

‘সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট’ ১৮ ডিসেম্বর, ২০১০ অনুষ্ঠিত

সুধি পাঠক! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, হুযূর (আই.) এর নির্দেশক্রমে এখন হতে ‘সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট’ নামে পাক্ষিক আহমদী-তে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হবে, যারা অপারগতায় অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন না বা দেখতে পারেন নি তারা এ অধ্যায় হতে অবশ্যই উপকৃত হবেন। কিন্তু সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে অনুষ্ঠান দেখার বিকল্প নেই। অ-আহমদী বন্ধুদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমেই এ অনুষ্ঠান সর্বাধিক সফল হতে পারে।

-মোহাম্মদ সোলায়মান, মুবাশ্বের মুরব্বী

বিঃ দ্রঃ এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত প্রশ্নোত্তর সরাসরি সম্প্রচারিত ‘সত্যের সন্ধানে’ অনুষ্ঠান হতে কাট ছাঁট ও সংক্ষেপ করে পাঠকের পিপাসা নিবারনের জন্য পেশ করা হয়েছে।

বিস্তারিত উত্তর শুনতে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখুন বা আমাদের www.ahmadiyyabangla.org ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

(১৮ ডিসেম্বর ২০১০ এর বাকী অংশ)

প্রশ্ন ঃ আসাদুজ্জামান, আশকোনা (অ-আহমদী অতিথি) – ইমাম মাহদী ও ঈসা (আ.) একই ব্যক্তি না দুইজন দুই ধরনের ব্যক্তি? আমরা জানি, মাহদী আলাদা ব্যক্তি আর ঈসা (আ.) আলাদা ব্যক্তি। আপনারা কোন পক্ষে বিশ্বাস করেন?

মওলানা ফিরোজ আলম ঃ আমরা সে কথাই বিশ্বাস করি যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, “লাল মাহদীউ ইল্লা ঈসা” ঈসা ব্যাতীত কোন মাহদী নেই। যিনি ঈসা, তিনিই মাহদী। ভিন্ন কোন ব্যক্তিত্ব নন। এটি ইবনে মাজা শরীফে আছে। একইভাবে আবু দাউদ শরীফে একই কথা আছে, তোমরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে মাহদী হিসেবে আসতে দেখবে। দুই হাদীসে একই কথা রয়েছে অর্থাৎ ঈসা (আ.)-ই মাহদী হবেন। দুজন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব নন।

প্রশ্ন ঃ জলিলুর রহমান সাহেব, দিনাজপুর, রাজাপুর – ঈসা (আ.) বলেছেন আমার পরে একজন নবী আসবেন তার নাম হবে আহমদ, এই আহমদ দ্বারা কি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বুঝানো হয়েছে না মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে বুঝানো হয়েছে?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান ঃ “ওয়া মুবাসশেরাম বেরাসুলি ইয়াতি মিম বাদিসমুহু আহমদ ...” সূরা সাফের এই আয়াতের মাঝে আহমদ বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কেই প্রাথমিকভাবে বুঝানো হয়েছে। রাসূলে আকরাম (সা.) আসবেন এই কথা বলার জন্য, এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য হযরত ঈসা (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি এসে বলেছেন, “আমার আরো অনেক কথা বলার ছিল তোমাদেরকে কিন্তু তোমরা সেগুলো এখন সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু যখন সেই পূর্ণ আত্মা আসবেন, সেই পবিত্র আত্মা আসবেন তখন তিনি এসে তোমাদেরকে সেসব কথা বলবেন তোমরা তখন সেগুলো শুনবে, আর যারা শুনবে না, তাদের কাছে প্রতিপালক প্রভু হিসাব গ্রহণ করবেন।’ হযরত ঈসা (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। রাসূলে আকরাম (সা.)-এর দুইটি প্রধান নাম একটি মুহাম্মদ (সা.) আর একটি হচ্ছে আহমদ (সা.)। হ্যাঁ যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তায় বিলীন হয়ে কোন এক আঙ্গিকে কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে কাউকে আহমদ ডেকে থাকেন আল্লাহ্ তাআলা, সেটা রাসূল করীম (সা.)-এর প্রতিবিম্ব হওয়ার কারণে। কিন্তু এটার প্রধান লক্ষ্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাঁর সত্ত্বায় বিলীন হওয়ার কারনে হযরত আকদাস ইমাম মাহদী (আ.)-ও এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এটা প্রধান লক্ষ্য নয়। প্রধান কথা হচ্ছে রাসূল আকরাম (সা.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সূরা সাফের মধ্যে দেওয়া আছে।

প্রশ্ন ঃ সাইফুল ইসলাম, মিরপুর – ঈসা নবী কি মারা গেছেন না জীবিত আছেন?

মওলানা ফিরোজ আলম ঃ কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) যিনি ইসরাইলি জাতির সংস্কারক হিসেবে এসেছিলেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন। কুরআনের অন্তত পক্ষে ত্রিশটি আয়াতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এটি উল্লেখ আছে যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। সূরা মায়েদার ১১৮নং আয়াতে আছে “ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী কুনতা আনতার রাক্বীবা আলাইহিম, ওয়া আনতা আলা কুল্লে শায়ইন শাহীদ। যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, হে আল্লাহ্ তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে এবং তুমি সকল বিষয়ের স্বাক্ষী।

এখানে পরিষ্কারভাবে ঈসা (আ.) আল্লাহ্ তাআলার দরবারে নিজের নিবেদন পেশ করছেন, হে আল্লাহ্ যখন আমাকে মৃত্যু দিয়েছো, তখন জাতির কি হয়েছে আর আমি জানি না। হযরত ঈসা (আ.) যদি জীবিত থাকেন, তিনি এসে খ্রিষ্টান জাতিকে তিন খোদার ইবাদতে মত্ত দেখবেন তখন তিনি কি আল্লাহ্‌র সামনে এ কথা বলতে পারবেন, আমি দেখি নাই বা আমি জানি না? এটা কি মিথ্যা হবে না? তাহলে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

তিনি যদি জীবিত থাকতেন, আবার পৃথিবীতে আসতেন তাহলে আল্লাহ্‌র দরবারে কেয়ামত দিবসে এ কথা বলার সুযোগ নেই। অনেকে ‘তাওয়াফ্‌ফা’র অন্য অর্থ করতে চান কিন্তু তাওয়াফ্‌ফা শব্দের অর্থ মৃত্যু অন্য কোন অর্থ নয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং নিজের জন্য এ আয়াত ব্যবহার করেছেন, এ শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাঁকে (সা.) দেখানো হয়েছে, তার যুগের অবসানের পর, তার শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে কিছু লোক। হাদীসে তাদের সাহাবী বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) দেখবেন যে তাদেরকে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন ভালবাসা বসত, তার দোহাই দিয়ে আল্লাহ্ তাআলাকে বলছেন “হে আল্লাহ্, এরা যে আমার স্নেহের সাহাবী এদেরকে কেন আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার মৃত্যুর পর

তারা কী করেছে। রাসূল (সা.) বললেন, তখন আমি ঠিক সেভাবেই বলবো যেভাবে আল্লাহ্‌র নেক বান্দা ঈসা (আ.) বলেছেন "ওয়া কুনতু আলাইহিম শাহিদাম মা দুমতু ফীহিম ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী কুনতা আনতার রাক্বীবা আলাইহিম। অর্থাৎ আমি তাদের উপর ততদিন তত্বাবধায়ক ছিলাম, যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, তখন হে খোদা তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে।

এখন বলুন এখানে **তাওয়াফ্‌ফা** শব্দ মুহাম্মদ রাসূল (সা.) ব্যবহার করেছেন, এ শব্দ কি তাকে আকাশে নিয়ে গেছে। না এর মাধ্যমে তিনি এ শব্দের অর্থ করেছেন। তাওয়াফ্‌ফা হওয়া সত্ত্বেও তিনি মদীনায় কবরস্থ আছেন। তাই স্পষ্ট, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন, আর এ আয়াতে ব্যবহৃত তাওয়াফ্‌ফা শব্দের অর্থ মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রশ্ন ঃ মামুন কবির, ঢাকাঃ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সুদ ভিত্তিক ব্যবস্থার বিষয়ে আহমদীয়া জামা'তের দৃষ্টি ভঙ্গি কি?

মাওলানা আব্দুল আউয়ালঃ সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আহমদীয়া জামা'তের বক্তব্য তাই যা সুদের বিষয়ে আল্ল?াহ্‌র বক্তব্য। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, আল্ল?াহ্ তাআলা ব্যবসা বানিজ্যকে হালাল করেছেন, আর হারাম করেছেন সুদকে। সুদ কাকে বলে? "সুদের সংজ্ঞা হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্বার্থে ঋন দেয় এবং সেই প্রদানকৃত ঋনের উপর লভ্যাংশ নির্ধারণ করে। যেখানে এ দুটি কথা সাব্যস্থ হবে, সেখানে সুদ কথা প্রযোজ্য হবে।

যদি ব্যাংকিং সিষ্টেমে, ব্যাংকের সদস্যরা নিজ স্বার্থে আপনাকে ঋন দেয়, এটা আপনাকে সাহায্য করার জন্য নয়, আপনার গলায় শেকল পড়ানোর জন্য। আর লভ্যাংশ নির্ধারিত আছে মাস শেষে কর্তন করা হবে। ঋন পরিশোধ না হলে জমি বা সম্পত্তি ক্রোক করা হবে। সুদের ব্যবসা সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত তাই যা কুরআন শরিফের সিদ্ধান্ত। আমি আবার বলছি, সুদ হারাম এবং যে সমস্ত ব্যাংক সুদ দেয় সেটা আমরা ব্যক্তিগত কাজে লাগাতে পারি না।

প্রশ্নঃ দাস বাবু, শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গঃ স্রষ্টার বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? স্রষ্টার উদ্দেশ্য সফল হলে কিরূপে হয়েছে আর ব্যর্থ হলে কিভাবে হচ্ছে?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খানঃ কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লেইয়া'বুদূন অর্থাৎ আমি মানুষ এবং জিন্নকে কেবল আমার উপাসনার জন্য সৃষ্টি করেছি। এটি হচ্ছে জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। আর বাকি সব জীব জন্তু বাকি সব গ্রহ নক্ষত্র সকল আয়োজন আমাদের সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেবামূলক একটি ব্যবস্থা। ইবাদত কি? এর একটি অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়িয়ে তপস্যা করা প্রনাম করা বা তার জন্য সিজদা করা। আরেক অর্থ হলো, তার রং ধারণ করা। আল্লাহ্ তাআলার যতগুলো বৈশিষ্ট আছে মানুষ সীমাবদ্ধ আকারে নিজের মাঝে কিছু না কিছু রপ্ত করতে পারে।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা প্রতিপালক প্রভূ তিনি লালন পালন করেন। মা বাবাও লালন পালন করেন, সমাজপতিরা সীমাবদ্ধ আকারে সমাজ লালন পালন করেন। এই যে গুণাবলী রয়েছে এগুলোকে আয়ত্ব করা আর তা বাস্তবায়ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করাও ইবাদত। সুতরাং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এ জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো যেন এগুলো মানুষের এই উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর একটি বিখ্যাত হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, কুনতু কানযান মাখফিয়্যান ফা আরাদতু আন উ'রাফা ফা খালাকতু আদামা। আমি এক মহান গোপন ভান্ডার ছিলাম আমি প্রকাশিত হতে চাইলাম তাই আমি আদমকে সৃষ্টি করলাম। এ গুণাগুণের পরিপূর্ণ বিকাশস্থল ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

অতএব আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। আমরা যতটুকু আল্লাহর রং-এ রঙ্গীন হবার চেষ্টা করবো আমরা আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট হচ্ছি। আল্লাহ তখন আমাদেরকে ভালবাসবেন, সাহায্য করবেন। আর যত আমরা উল্টো পথে হাটবো ততই আমরা আল্লাহ্‌র মহা পরিকল্পনার বিরোধীতা করছি, আল্লাহ্‌র সাহায্যও আমাদের সঙ্গ দিবে না। এজন্য আমি অকপটে এটি বিশ্বাস করি, আল্লাহ যখন কোন পরিকল্পনা নেন তিনি কখনও ব্যর্থ হতে পারেন না।

মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির উদ্দেশ্য আজ সফল হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, আমরা যেন রাসূলুল্লাহর আদর্শকে অনুসরণ করে নিজেদেরকে সফল করতে পারি।

মওলানা ফিরোজ আলমঃ মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং তাকে চিনে। কিন্তু মানুষের বাইরে বিশাল জগত আছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ-তে রত আছে। ইম মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বেহু বে হামদিহী। এমন কোন কিছু নেই যা খোদা তাআলার ইবাদত করছে না। তাই খোদা কখনও ব্যর্থ নন। মানুষ যদি ইবাদত না করে তাহলে মানুষ ব্যর্থ। কিন্তু মানুষের বাইরে বিশাল জগত আছে যা খোদা তাআলার ইবাদতে রত।

প্রশ্নঃ রফীকুল ইসলাম, ঃ আমি আহমদী হয়েছি কিন্তু পরিবারের লোক বিশ্বাস করছে না যে আমি আহমদী হয়েছি। আমি কিভাবে বিশ্বাস করাবো যে আমি আহমদী হয়েছি?

মওলানা ফিরোজ আলমঃ কিন্তু আপনার সমস্যা অন্যদের তুলনায় উল্টো। অন্যান্য পরিবারে কেউ যদি বলে আমি আহমদী হয়েছি তাহলে প্রথমে মার খায় বা ঘর থেকে বিতাড়িত হয় কিন্তু আপনার ঘরে বিশ্বাসই করতে চাচ্ছে না যে, আপনি ইমাম মাহদী (আ.)-কে মেনেছেন। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আমুল পরিবর্তন আনুন সেই পরিবর্তনের আয়নায় তারা দেখবে আপনি এখন ভিন্ন কোন ব্যক্তিত্ব। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে যখন কেউ মানে তখন তার মাঝে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে।

অনেক এমন ঘটনা আছে কোন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে তার পূর্বের এবং পরের জীবন দেখে শুধু তার পরিবারই নয় বরং পুরো সমাজই বলে, এই লোকটি এখন পাল্টে গেছে। আপনার আচার আচরণ দেখে তারা বুঝবে যে এখন আপনি ভিন্ন কোন ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয় হলো, এখন সত্য গ্রহণ করেছেন তাই কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক এটি এখন আত্মীয়-স্বজনের মাঝে প্রচার করুন। তাদেরকে বলুন এটি কোন ফেলে দেয়ার কথা নয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, শেষ যুগে ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত থেকে ঈসা ইবনে মরীয়ম নামে এক মহাপুরুষের আগমন হবে তার আরেক নাম হলো মাহদী তিনি এসে গেছেন। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন তার আগমনের সংবাদ শুনলে তাকে গ্রহণ করবে এবং তার হাতে বয়াত করবে। আপনি আপনার আত্মিয় স্বজনকে এই তবলীগ করা আরম্ভ করুন এরপর দেখুন তারা কি বলে।

প্রশ্নঃ শাহ মাহমুদ রায়হান, রাশিয়াঃ বিজ্ঞান চর্চাকে জামাত কতটুকু উৎসাহ প্রদান করে?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খানঃ বিজ্ঞান চর্চাকে আমরা ততটুকুই গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক বলে মনে করি যতটুকু কুরআন শরীফ এটিকে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক বলে উল্লেখ করেছে। কুরআন শরীফে কেবল বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করাই হয়নি বরং বলা হয়েছে 'যারা দাড়িয়ে, বসে,

নিজেদের পার্শ্বদেশে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের বিষয় চিন্তা করে আর বলে হে আমাদের প্রভূ! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি করনি। বিজ্ঞান চর্চা আর আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষনা করা একজন মোমেন বিশ্বাসীদের আবশ্যক দায়ীত্ব'। হযরত খলীফাতুল মাসীহ রাবে (রাহে.) বলতেন, সাইন্স ডিলস উইথ ডীডস অব গড এন্ড কুরআন ইজ দি ওয়ার্ড অব গড। কুরআন শরীফ পড়ুন আর সেই চশমা পড়ে গবেষণা করুন দেখবেন খুব সহজে সাফল্য লাভ করবেন। আল্লাহ্ তাআলা সূরা মুলকের শুরুতেও এ কথা বলেছেন, 'ভাল করে চেয়ে দেখ আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির মাঝে কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না।' এই যে অসামঞ্জস্য দেখতে না পাওয়া এটি হলো গবেষণার ব্যাপার। অতএব আপনাকে শুভেচ্ছা জানাই। আপনি মাইক্রো বায়োলজি নিয়ে গবেষণা করছেন, আরো বড় গবেষণা করতে চান আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দিন। আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের দায়িত্ব বেশী করে পড়াশুনা করা আর আল্লাহ্‌র রহস্য উদ্ঘাটন করা।

প্রশ্নঃ মজীবুর রহমান, শালশিড়ি পঞ্চগড়ঃ আমরা সবাই মোবাইল ব্যবহার করছি এর যে মেমোরি কার্ড থাকে এর মাঝে অনেক গানও থাকে। এটি কি পবিত্র না অপবিত্র?

মওলানা ফিরোজ আলমঃ আধুনিক যন্ত্রপাতী আবিষ্কৃত হয়েছে সত্যের প্রচারের জন্য মানুষকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য। কোন যন্ত্র নিজ থেকে কোন কিছু করতে পারে না। তাদের ভিতর একটি ব্রেইন ঢুকিয়ে দিতে হয়, তাদের পরিচালনা করতে হয়। বুদ্ধিমান সে, যে এ সকল যন্ত্রকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও ইচ্ছার অধিনে ব্যবহার করে। তাই মোবাইল যন্ত্রটির নিজের কোন দোষ নেই। এটিকে ভাল কাজে ব্যবহার করুন। এখন যেমন আপনি মোবাইলে ফোন করেছেন। আর এ মোবাইল ফোন করে আপনি ধর্মীয় কাজ করেছেন । আপনি ধর্ম বহির্ভূত কাজ করেন নি।

প্রশ্নঃ রোকসানা কিরমানি, আমেরিকাঃ আমি শুনছি যে, আহমদী যারা উনারা নাকি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী হিসাবে মানেন না। তো আমি এটা জানতে চাই যে কথাটা সত্য কিনা?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খানঃ আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী হিসাবে মানি। কুরআন শরীফে শেষ শরীয়তবাহক নবী হিসাবে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে শেষ নবী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল ইয়াওমা আকমালতু দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নে'মাতী ওয়া রাযীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা। (সূরা মায়েদা : ৪)। আজকের দিন আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করলাম। তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম। এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। এর মাধ্যমে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে। এই অর্থে আমরা অবশ্যই তাঁকে শেষ নবী বলি। আরেক অর্থেও সূরা নযম এর মধ্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। হুযূর (সা.) সমস্ত নবীদের পার করে সমস্ত নবীদেরকে অতিক্রম করে শেষ আধ্যাত্মিক মার্গে উপনীত হয়েছিলেন। আধ্যাত্মিকতার যত স্তর আছে সব অতিক্রম করে যতটুকু একজন মানব নবী আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে সেই নৈকট্যে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। সূরা নযমে বলা হয়েছে, এই নবী (সা.) শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছিলেন। আধ্যাত্মিকতার শেষ সীমানায় শেষ মার্গে যিনি উপনীত হন তাঁকে আমরা শেষ নবী বলে মানি। এই দুই অর্থে কুরআন দ্বারা এবং হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় হুযূর (সা.) শেষ নবী। কিন্তু যদি বলা হয় হুযূর (সা.)-এর পরে কোন ধরনের নৈকট্য প্রাপ্তির সুযোগ নাই আমরা এটার সাথে দ্বিমত পোষণ করি। কেননা স্পষ্টভাবে হুযূর (সা.) নিজে বলেছেন কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে আল্লাহর নৈকট্য এবং বাণী প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত। বানী শরীয়তের বাণী নয়। শরীয়তের উপর আমল করার বাণী।

হে বান্দা আমি তোমাকে কবুল করেছি। হে বান্দা! আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার প্রেম আমার কাছে গৃহিত হয়েছে। আমি তোমাকে নিদর্শন দিব। নৈকট্যের প্রকাশ ঘটাব। এই বাণী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পেতে পারেন। ঈসা নবী উল্লাহ্ আসার ভবিষ্যদ্বণী ছিল। তিনি স্বাধীন সার্বভৌম নবী নন। তিনি হচ্ছেন আনুগত্যকরী নবী, তিনি হচ্ছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যিনি হুযূর (সা.)-এর আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নৈকট্য লাভ করেছিলেন। আর সেই নৈকট্যই তিনি লাভ করে দাবী করেছেন। অতএব, শেষ নবীর সাথে হযরত রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উম্মতী নবুওয়াতের কোন দন্দ্ব নাই।

প্রশ্নঃ শামসুল আরেফীন, ঢাকা এবং রোকসানা কিরমানী, আমেরিকাঃ আহমদীয়া মসজিদে নাকি কেবল তাদের নিয়েই আলোচনা হয় কুরআন ও হাদীস নিয়ে আলোচনা হয় না। আহমদীদের উদ্দেশ্য তাহলে কী?

মাওলানা ফিরোজ আলমঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর পুস্তিকা 'আল ওসিয়্যত'-এ তাঁর জামা'তের উদ্দেশ্যে তিনি পরিস্কারভাবে লিখেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন জনবসতিতে বসবাসকারী বিভিন্ন রং ও বর্ণের মানুষকে এক পতাকাতলে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করা আর সমবেত করা হলো আমার আগমনের মূল উদ্দেশ্য তিনি তাঁর আনুগত্যকারীদের বলেছেন, নম্রতা, বিনয়, সাধুতা, ভদ্রতা ও খোদাভীতির মাধ্যমে এ লক্ষ অর্জনে সবাই নিয়োজিত হও। অপর একস্থানে তিনি লিখেছেন, আমি বিলুপ্ত মূল্যবোধকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি। আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। যেভাবে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ইয়ামলাউল আরযা কিসতাও ওয়া আদলান কামা মুলেয়াত যুলমাও ওয়া যুরা। (আবু দাউদ) যেভাবে পৃথিবী অনাচার আর কদাচারে পরিপূর্ণ ছিল ইমাম মাহদী এসে তা থেকে পৃথিবীকে পরিস্কার করবেন এবং পৃথিবীতে তিনি শান্তি, ইনসাফ, ন্যায় বিচার এবং সুবিচারের রাজ এবং রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। আর কুরআন শরীফে আছে, লে ইউযহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহি অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করা অর্থাৎ সমস্ত মানবতাকে সমর্পন শিখানোর জন্য ইমাম মাহদী আসবেন। এটি হল ইসলামের বিজয়।

আহমদীদের মসজিদে নাকি কুরআন হাদীসের জ্ঞান দেওয়া হয় না। শুধু আহমদী চর্চাই চলে ।

এটি আসলেই আপনার শুনা কথা। আহমদীয়া মসজিদে যে যায় সে জানে সেখানে কি কি আলোচনা হয়। আহমদীয়া মসজিদে খোদা এবং তাঁর রাসূলের বাইরে কোন কথা আলোচনা হয় না। আর এ জন্যই আহমদীয়া মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এ জন্যই ইমাম মাহদী (আ.) এসেছেন। এখনতো ব্যাপারটা খুব সহজ। আপনার ঘরে যদি ডিশ থাকে আর আপনি সেটা অন করে আহমদীয়া চ্যানেল খুলে প্রত্যেক শুক্রবারে আহমদীয়া জামাতের খুতবা শুনেন তাহলে আপনি দেখবেন যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খোদা এবং রাসূলের ভালবাসার কথাই শুধু হয়। আর ইসলাম কিভাবে পৃথিবীতে জয় যুক্ত হতে পারে সেই আলোচনা হয় । ইসলামের উপর যে আক্রমণ হচ্ছে পাশ্চাত্যে এবং অন্যান্য স্থানে আক্রমণকে খন্ডন করা হচ্ছে। সেই আক্রমণ প্রতিহত করা হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নতের আলোকে।

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান সাহেব কিছু যোগ করতে গিয়ে বলেন-যুক্তরাষ্ট্রে আছেন বা নিইউয়র্কে আছেন। সেখানে ৫টি জায়গায় জামাতের ৫টি মসজিদ আছে সেখানে আপনি বলুন, আমি আহমদীয়া জামাতের সদস্য নই আমি আপনাদের

সম্বন্ধে জানতে চাই। আপনি কয়েক বার যান এবং কোন নোটিশ ছাড়াই যান। গিয়ে দেখুন, তারা কি আলোচনা করে। কুরআন শরীফ, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা, তার সুন্নত এবং হুযূর (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারীর মসীহ মাওউদ এবং ইমাম মাহদী (আ.) কুরআন এবং হাদীসের যে ব্যাখ্যাটা উপস্থাপন করেছেন তা নিয়েই আলোচনা হয়। এটাই হচ্ছে আহমদীয়া জামাতের সারাংশ এটার জন্য আহমদীয়া জামাতের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত।

প্রশ্নঃ জাকির হোসেনঃ কেন পশ্চিম বাংলার আলেম ওলামারা এটা বলেন, ইমাম মাহদী এখনও আসেননি। জামাতে আহমদীয়ার বক্তব্য যে ইমাম মাহদী (আ.) এসেগেছেন। এই যে মতপার্থক্য আপনারা যদি বিষয়টি স্পষ্ট করেন তাহলে খুবই ভাল হয়।

মওলানা ফিলোজ আলমঃ ইমাম মাহদী (আ.) যদি না আসেন তাহলে এত চুরি, এত ব্যভিচার, এত হানাহানি, এত খুনাখুনি, মারা-মারি আর ঘুষের রাজত্ব আর যে বার বার বলা হচ্ছে কলি কাল এসে গেছে। পৃথিবীতে এত অশান্তি কেন? রাসূল করীম (সা.) ইমাম মাহদীর আগমনের লক্ষণ বলে গেছেন পৃথিবীতে অশান্তির পাদুর্ভাব হবে, শান্তি উঠে যাবে। কথা কথায় তো বলা হয় শান্তি নেই দুনিয়াতে, কলি কাল এসে গেছে। প্রকৃত সৎ মানুষ আজকে দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া যায় না। পশুত্ব বিরাজ করছে সর্বত্রে । এই সব কিছুর উপস্থিতিতে যা রাসূল (সা.) বলেছেন যে, এমন অবস্থার যখন প্রাদুর্ভাব হয়। তখন তোমরা পৃথিবীতে ইমাম মাহদীকে খুঁজবে। আর এ অবস্থা যে আজকে বিরাজ করছে এটা শুধু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই বলে না, উপমহাদেশের যারা বড়বড় বুযুর্গ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন তারাও লিখে গিয়েছেন। কি হয়েছে আজকে মুসলমানদের। ইকবাল লিখে গেছেন যে, এই মুসলমান যাদেরকে দেখে ইহুদীরাও লজ্জা পায়।

এই হলো সার্বিক চিত্র। এখনও যদি বলা হয় যে, কেউ আসেননি তাহলে সবার মরার পর লাশ কে ঠিক করার জন্য কি আল্লাহ্‌র মাহদী আসবেন? মানুষ হাতছানি দিয়ে সেই মহাপুরুষকে ডাকছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের বড়বড় বুযুর্গরা লিখে গেছেন, তাদের সন্তান সন্ততিকে নসিহত করে গেছেন, অগণিত বই-পুস্তক লিখে গেছেন, ইমাম মাহদীর আগমনের সময় হয়ে গেছে। অনেকে নিজের সন্তানকে বলে গিয়েছেন যে আগামী ১৫/২০ বছরের মধ্যে ইমাম মাহদী আসবে, তিনি যখন আসবেন তাঁর হাতে বয়আত করো তাঁর বিরোধীতা করো না। এটি আসলে সত্যকে কোনভাবে এরিয়ে চলার একটি কুটতর্ক, নিজেদের যে ব্যবসা আছে সে ব্যবসা মোল্লারা চায়না যে নস্ট হউক। কেননা আল্লাহ্‌র মহাপুরুষ আসলে প্রথমে এই ধরনের ব্যবসায়ীদের উপর আঘাত হানে। তা এই কারণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধীতা হয়। আপনি নিশ্চিত জানুন যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসে গেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলার ফজলে তার জামা'ত সারা বিশ্বে কাজ করছে। বিশ্বের প্রায় দুইশত দেশে এই জামা'ত পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ভিতর ইসলাম প্রচার করছে।

প্রশ্নঃ মওলানা হাফেজ শাহজালালঃ আমি দুই মাস হয়েছে আহমদী হয়েছি। আমি যখন আমার আত্মীয়দের কাছে ইমাম মাহদীর কথা বলি তখন তারা সহজে মানতে চায়না এবং বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বলে, এটা কেমন ভাবে আসে এখনও তো আসার সময় হয় নাই। যদিও বা এসে থাকে আমরা শুনি নাই কেন? এটা কেমন কথা যে এতবড় একজন নবী আসবে সে নবীর কথা আমরা শুনতে পাব না। ইমাম মাহদী আসলে জগত আলোকিত করে ফেলবে আর তার কথা আমরা শুনি নাই আর যখন আমরা আলেম সমাজে বলি তখন তারা মানতেই চায় না এর কারণ কী?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খানঃ ইমাম মাহদী (আ.) যদি সত্য হয়ে থাকেন তাঁর সাথে সেই ব্যবহারই করা হবে, যে ব্যবহার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে করা হয়েছিল। তাঁর সাথে সে ব্যবহারই করা হবে যে ব্যবহার সমস্ত নবী রসূলদের সাথে করা হয়েছিল। কুরআনে উল্লেখ আছে 'বড়ই পরিতাপ আমার বান্দাদের জন্য যখনই আমার কাছ থেকে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ এসেছে তারা তাঁর অবশ্যই বিরোধীতা করেছে'। ইহুদীদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তোমাদের কাছে যে মসীহর আসার কথা ছিল তিনি কি এসে গেছেন? তারা বলবে, না আসেন নাই। খ্রিষ্টানদের কে জিজ্ঞেস করেন যে মহান পবিত্র আত্মার কথা আসার কথা ছিল তাকে মানতে হবে তিনি কি এসে গেছেন? তারা বলবে না আসেননি।

ঠিক একই পথ ধরেছে মুসলমানদের একটি অংশ। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন কবে আসবেন? আজ থেকে ১৫০ বছর আগে আপনারাই বলতেন আজ থেকে কুড়ি বছর আগেও আপনারাই বলতেন, আসছেন আসছেন, এই এলেন বলে। বাংলাদেশের মওলানা তাজুল ইসলাম (বুলবুলে বাংলা নামে পরিচিত) তিনি তার যুগে সমস্ত বিরোধীতাও করেছেন আহমদীয়া জামাতের তিনি বলে গেছেন কুড়ি বছরের মধ্যে ইমাম মাহদী না আসেন তবে এই মির্যা সাহেবই সত্য। নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব ভূপাল তিনি তার বইতে লিখেছেন। সমস্ত লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়েছে। মাহদী প্রকাশিত হলেন বলে। আজ তাকওয়ার সাথে জিজ্ঞাস করুন, যদি বলেন আসেন নি তাহলে বলুন, কবে আসবেন? আপনি ঠিক বলেছেন সমস্ত চ্যানেলগুলি এ ব্যাপারে নিরব থাকে। তাদেরকে খুচিয়ে খুচিয়ে জিজ্ঞাস করতে হবে ভাই মাহদী কবে আসবেন, ঈসা কবে আসবেন, এটা বলুন। উনারা শুধু পিছাতে থাকবেন যেভাবে ইহুদীরা পিছিয়েছিল। তারাও বলতো, আসেন নি, আসার কথা, আসবেন। আবার হযরত ঈসা (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেনে পূণ্য আত্মা আসবে তারাও ট্রেন মিস করে বসে আছে। সে জন্যই তো দোয়া শিখানো হয়েছে। যে ভুল করেছে ইহুদীরা, খ্রিষ্টানরা সে পথে আমাদেরকে চালিও না। আপনার কাছে আবেদন, কুরআন শরীফ খুলে তাদেরকে দেখান। সূরা ফজরের ভিতরে দশ রাত, তারপরে বিজোর দুইটি রাত। তারপরে একটি বেজোড় রাত মোট তেরটি রাতের পর এই অন্ধকার অমানিষার অবসান ঘটবে বলা আছে।

সূরা আস সাজদার ভিতরে লিখা আছে। হাজার বছরে আল্লাহ্‌র বিধান উঠে যাবে। হাদীস শরীফে রাসূল আকরাম (সা.) বলেছেন, তিনশত বছর পর্যন্ত আলোকিত যুগ এরপর মিথ্যার পাদুর্ভাব ঘটবে। আর সেই মিথ্যার পাদুর্ভাবের সম্পন্নতা হবে এক হাজার বছর । তিনশত বছর পর্যন্ত আলো থাকবে।

তারপর এক হাজার বছরে অন্ধকারের চরম অমানিষা ঘনিয়ে আসবে। যখন চরম অন্ধকার দেখা দেয় তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আলো সুপ্রভাত সুচিত হয়। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌র নামে এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আর কেউ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবী করে টিকতে পারে নাই। আপনাদেরকে আহবান জানাই, যাচাই করুন, যদি মিল খায়, আপনার অন্তর যদি মানে তাহলে গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি।

প্রশ্নঃ জায়নাল জাকেরীনঃ আমি আহমদীয়া জামা'ত বুঝেছি, কিন্তু বিরোধীতার কারণে আমি গ্রহণ করলেও তা গোপন করে তা পালন করা যাবে কিনা?

মওলানা ফিরোজ আলমঃ গায়ের আহমদীদের মসজিদের ইমামের পিছনে নামায পড়া যাবে না। কারণ আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতাকে যারা গালি দেয় তাদের ইমামের পিছনে নামায পড়ার নির্দেশ নাই।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **'হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আগমন'**। পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আগমন

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, মুসলমানদের চরম অবনতির সময়, তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা ঈসা (আ.)-কে ইমাম মাহদী রূপে আবির্ভূত করবেন। এ জন্যই হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, "মাহদী ঈসা (আ.) ব্যতীত আর কেউ নন" (ইবনে মাজা)। তাঁর আগমনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে। তাঁর আগমনের প্রধান লক্ষন হলো, রমযানের চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে (দারকুতনী)। হাদীস শরীফে তাকে হাকামান আদালান ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী বলা হয়েছে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন ইত্যাদি (বুখারী)। হাদীস শরীফের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথা সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ তিনি প্রথম বয়আত গ্রহণ শুরু করেন। তাঁর আগমনের প্রধান লক্ষণ হলো একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধে ও ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে সংঘটিত হয়ে তাঁর সত্যতার প্রমাণ দিয়েছে। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেন যে, বনী ইসরাঈলের ঈসা (আ.) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন এবং শেষ যামানায় যাঁর আসার কথা সেই ব্যক্তি তিনি নিজে। হযরত ঈসা (আ.)-এর গুণে গুণান্বিত হয়ে আসার জন্য তিনি মসীহ্ মাওউদ নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, তাঁর কবর কাশ্মীরের শ্রীনগরের খান ইয়ার স্ট্রীটে বিদ্যমান। তিনি জানান যে, কুরআন পাকের প্রায় ৩০টি আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ আছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণের দ্বারা খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ খন্ডনের মাধ্যমে তিনি যেমন ক্রুশ ধ্বংস করেছেন। তেমনি মুসলমানদের হযরত ঈসা (আ.)-কে চৌথ আসমানে উঠার ভুল ধারণার স্থলেও কুঠারাঘাত করেছেন। হযরত ঈসা (অ.)-এর মৃত্যু প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন পাকের ৩ : ৩৬ আয়াতে বলেছেন, "হে ঈসা নিশ্চয়ই আমি তোমার মৃত্যু (ওফাত) দিব এবং নিজের দিকে তোমাকে উন্নীত করবো।" এই আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হয়।

হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে মাহদীর সুসংবাদ দিতেছি। তিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন সময় আবির্ভূত হবেন, যখন মানুষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে এবং বহু ভূমিকম্প হবে।" (নাজমুস সাকিব, ২য় খন্ড, ১১ পৃ:)।

উপরোক্ত হাদীস ও পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতে যে যুগে ঈমান থাকবে না তখন আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা ঈমানকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর তিনি হলেন ইমাম মাহদী (আ.) বা প্রতিশ্রুত মসীহ্। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই শেষ যুগের আগত মসীহ ও ইমাম মাহদী। তাঁর মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামর প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত রূহানী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসমত আরা চৌধুরী (উর্মি), চট্টগ্রাম

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন

যুলুম অত্যাচারের রাজত্বের পর আবার পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসার ভবিষ্যদ্বাণী হযরত রাসূল করীম (সা.) করেছেন যা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে হবে।

অনেকেই মনে করেন, আমরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সবই পালন করছি ও মানছি তাহলে আবার ইমাম মাহদী আসার কী প্রয়োজন আছে? আবার উম্মতের বেশির ভাগ লোকই হযরত ইমাম মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় দিন গুণছেন? ইতিমধ্যে অনেক পীর, মাওলানাগণ ইমাম মাহদীর আগমনের দিন তারিখও উল্লেখ করে গেছেন কিন্তু এখনও ইমাম মাহদীর আগমনের সংবাদ না পাওয়াটা কি হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার পরিপন্থি নয়? নাউযুবিল্ল?াহ। আমাদেরকে দেখতে হবে যিনি চতুর্দশ শতাব্দির দাবীকারক মাহদী তিনি সত্য কিনা। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর উহার সন্নিহিতগণ, তারপর উহার সন্নিহিতগণ, অতপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে। (নিসাই ও মিশকাত, বাব মুনাকেব সাহাবা)।

হযরত রাসূল করীম (সা.) এর সোনালী যুগ তিনশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে এক হাজার বছর পরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব হওয়ার কথা।

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর তিনশ' বছরের পর চতুর্থ শতাব্দী থেকে ক্রমাবনতির ধারায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইসলাম আল্ল?াহর দিকে উঠে যাবে আর পৃথিবীতে ইসলাম শুধু নামে মাত্র থাকবে, ইসলামের চরম অধপতন ঘটবে। ইসলামের এই অধপতন থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতেই পাঠাবেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন হওয়ার কথা ১২০০ হিজরী সনের পরে। কিন্তু ১২শ' হিজরী পার হয়ে বর্তমান ১৫শ' হিজরী শতাব্দী চলছে। হযরত ইমাম মাহদী

(আ.)-এর আগমন যদি এখনও না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর আসার সময় কখন?

হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমরা আকাশের নিম্নস্থ সব সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফেৎনা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে' (মিশকাত)।

এই হাদীস থেকে এটা কি প্রতিপণ্য হয় না যে এটাই আখেরী জামানা এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.) -এর আবির্ভাবের সময়? হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সব লক্ষণ পূর্ণ স্বাপেক্ষেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ পেয়ে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হিসেবে দাবী করেন। যেহেতু তিনি খোদার পক্ষ থেকে ছিলেন তাই খোদা তাআলাই তাঁর জামা'তকে দিনের পর দিন উন্নতি দান করছেন। যদি তিনি মিথ্যা হতেন তাহলে খোদা তাআলা কবেই না তাঁকে ধ্বংস করে দিতেন। যেভাবে মিথ্যা দাবীকারকদের তিনি ধবংস করেছেন । দাবীর পর টিকে থাকাটাই সত্যতার বড় নিদর্শন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে খুব শীঘ্র সেই মহান প্রতিশ্রুত দিন দেখার তৌফীক দান করুন এবং সবাই যেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে খোদার আযাব থেকে রক্ষা পায় এবং আর আমরা সবাই যেন তাঁর মৃত্যুর পর খোদা তাআলা প্রদত্ব বরকত মন্ডিত নেযামে খিলাফতের অধীনে থেকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও

চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) -এর আগমন

পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথে আনয়নের জন্য যুগে যুগে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সতর্ককারী পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল নবীকূল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্মকে পূর্ণ মর্যাদা দান করে গেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এবং চারজন নিষ্ঠাবান খলীফার দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর ইসলাম পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ইসলাম ধর্মের মানুষ বিভিন্ন অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হতে থাকে। যে যার খুশিমত দুনিয়াবী ফিৎনা-ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ঘটে। মহানবী (সা.) বলেছেন– "ইমাম মাহদী যাহির হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর হাতে বয়আত করিও, যদিও পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহদী" [শুনানে ইবনে মাজা]

উপরের হাদীস অনুসারে ১৮৮৯ খৃ: বা ১৩০৬ হিজরী সনে ভারতে পাঞ্জাব প্রদেশের এক নিভৃত গ্রামে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবার দাবী করেন। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও রাসূল করীম (সা.)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণে ও তাঁর আনুগত্যে তাঁরই উম্মতের মধ্য হতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আগমন করেন। যুগের মাহদী বিভিন্ন ধর্মের ও তথাকথিত মোল্লাদের রোষানালে পরেও তিনি তাঁর জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি (আ.) বিভিন্ন প্রকার আধ্যাত্মিক আলো দ্বারা প্রমাণ করেন যে, তিনিই মসীহ্ ও ইমাম মাহদী। বর্তমানে তাঁরই খলীফাগণ তাঁর জামা'তকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন পঞ্চম খলীফার খিলাফত কাল বিদ্যমান। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তা বহাল থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ তাআলা সকলকে আহমদীয়াত সম্পর্কে বুঝার তৌফিক দান করুন, আমীন।

এস, এম, সানাউল্লাহ্, ঘাটুরা, বি.বাড়িয়া

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে একমাত্র সত্য মাহদী হিসেবে দাবীকারক হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের কথা বললে অনেকেই এই কথা বলেন যে, তার আগমনের সময় এখনও হয় নাই, কেয়ামতের পূর্বে তাঁর আগমন হবে। আবার কেউ বলেন যে, তার আগমনের সময় হয়ে গেছে, বিশ্ব পরিস্থিতি যেভাবে নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত তাতে তাঁর আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে, যে কোন মুহূর্তে আগমন হতে পারে। আবার কেউ বলেছেন তার জন্ম হয়ে গিয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করবেন। আবার একজন মওলানা সাহেব তার বইতে লিখেছেন যে ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্ম সম্বন্ধে বা পৃথিবীতে আগমন সম্বন্ধে যা আমি লিখছি এটা আমাদের ধারণা। এ সম্পর্কে কেউ আমাদের কাছে কুরআন হাদীসের অকাট্য প্রমাণ দাবী করলে তা আমরা উপস্থাপন করতে পারব না। আবার তিনি একথাও লিখেছেন যে, গোটা বিশ্বের শান্তির চাবি-কাঠি থাকবে তার হাতে যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে আসবেন।

যিনি আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত ব্যক্তি হন তিনি অবশ্যই খোদা তাআলার পক্ষ হতে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েই আসেন। তাঁর আগমনের সঠিক সময় জানা আমাদের প্রত্যেকেরই একান্ত প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে আমি কয়েকজন বিশিষ্ট মওলানা সাহেবের কথা আলোচনা করছি। ১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঈশ্বরদীর (পাকশীতে) ইসালে সওয়াব মাঠে বিরাট ইসলামী চিন্তাবিদ ফুরফুরা শরীফের পীর মোহাম্মদ আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেব হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন ইমাম মাহদীর জন্ম হয়েছে, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করবেন। কিন্তু সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেন নাই।

২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে সৌদী আরব থেকে আগত তবলীগ জামা'তের আমীর বিশেষ আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন Imam Mahadi is Knocking at the dore. ইমাম মাহদী দরজায় কড়া নাড়ছেন। এভাবে আরও অনেক ব্যক্তির কথা বিভিন্ন বই-পুস্তকে আলোচনা হয়েছে কিন্তু কেউই সঠিক সময়ের কথা কুরআন, হাদীস থেকে উপস্থাপন করতে পারেন নাই।

পবিত্র কুরআনের সূরা আস-সাজদাতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তিনি আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে হুকুম পরিবর্তন করবেন। অতঃপর এটা তার দিকে উঠে যাবে একদিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বৎসর। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে যে জীবন ব্যবস্থা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তা একদিনে পৃথিবীতে উঠার কথা বলা হয়েছে এবং সেই একদিন যা মানুষের গণনানুসারে এক হাজার বৎসর। অন্যদিকে হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন যে, আমি যে শতাব্দিতে আছি তা-ই সর্বোত্তম শতাব্দী তৎপর সন্নিহিত শতাব্দী তৎপর তৎসন্নিহিত শতাব্দী (তিরমিযী, বুখারি) এই তিন শত বৎসরের অগ্রগতি ও বিজয়ের পর ধরে ইসলামের অধ:পতন চলতে থাকে। অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন ঈমান সপ্তর্ষি মন্ডলে উঠে যাবে এবং তা পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি ইহাকে সেখান থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন। কুরআনে বর্ণিত একহাজার বৎসর এবং হাদীসে বর্ণিত তিনশত বৎসর এক সাথে যোগ করলে দেখা যায় যে, তেরশত বৎসর ইসলামের অধ:পতনের যুগ এই তেরশত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর চতুর্দশ শতাব্দীতে সূরা নূরের আয়াত ইস্তেখলাফ এবং খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত (নবুওয়াতের ধারায় খিলাফত) হাদীস অনুযায়ী ইসলামে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার কথা ছিল। এখন প্রশ্ন হল এই খিলাফত বর্তমান পৃথিবীর মুসলমানদের মাঝে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

আজকের মুসলিম বিশ্বে কি কোন খলীফা আছেন, যাকে সারা বিশ্বের মুসলমানরা মেনে চলছেন? মহানবী (সা.) প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে যে মুজাদ্দীদ আগমনের কথা বলে গেছেন সেই হিসাব মোতাবেক প্রতি শতাব্দীতেই মোজাদ্দিদ এসেছেন এবং তাদের নামও পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ.)। কিন্ত যখন আলেমদের কাছে প্রশ্ন করা হয় যে চৌদ্দ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ কে? তখন তারা এর কোন জবাব দিতে পারেন না অপরদিকে চতুর্দশ শতাব্দীতে যুগ ইমাম হিসেবে দাবীকারক ব্যক্তি একজনকেই দেখা যায় আর তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। এত বড় একটা বিষয়কে অল্প কথায় মানুষকে বুঝানো বেশ বড় ব্যাপার।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে ইমাম মাহদী হওয়ার একমাত্র দাবীদার হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। তিনি বলেছেন আমার নিকট হাজার হাজার প্রমাণ আছে। কিন্তু যদি এতে সন্তুষ্ট হতে না পার তবে আমার কথা গ্রহণ করো না–আমার বিরোধীদের কথাও গ্রহণ করো না, খোদা তাআলার নিকট যাও এবং জিজ্ঞাস কর, আমি সত্যবাদী কিনা যদি খোদা তাআলা বলেদেন আমি মিথ্যাবাদী তবে নিশ্চয়ই আমি মিথ্যাবাদী কিন্তু যদি খোদা তাআলা বলেছেন, আমি সত্যবাদী তবে আমার সত্যতা গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি কেন?

খোদা তাআলা সকল মানুষকে সত্য চেনার ও মানার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান, ঈশ্বরদী, পাবনা

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) -এর আগমন

হাদীসে উল্লেখ আছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে ভালভাবে অবগত হয়েছি যে, আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শেষ বা প্রথমে দ্বীনের সংস্কার পুনরুজ্জীবনের জন্য এক বা একাধিক সংস্কারক প্রেরণ করবেন। (আবুদাউদ)

যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাই ইসলাম ধর্মের গ্লানি আসবে, মুসলমানরা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হবে। একদল অন্যদলকে কাফির ফতুয়া দিবে। বিভিন্ন জাতি ধর্মে ফেতনা ফাসাদ হবে, তখন আল্লাহ্ ইসলামকে পৃথিবীতে পুন:প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই উম্মতের মধ্য থেকে এক বা একাধিক মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবেন। তিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামকে জয়যুক্ত করবেন।

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হবে সর্বতোভাবে ইমাম মাহদীকে সাহায্য করা অথবা বলেছেন, তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া" (সুনানে আবুদাউদ কিতাবুল মাহ্দী)।

তিনি (সা.) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। (মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)

আল্লাহ্ তাআলা হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ইমাম মাহ্দীকে পাঠিয়েছেন। তিনি ১৮৩৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতের গুরুদাসপুর জেলায় কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি ২৩ মার্চ ১৮৮৯ হিজরী সনে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভিত্তি স্থাপন করেন ।

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করার প্রায় ১২১ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ জামা'ত বর্তমান সারা বিশ্বের দুইশতটি দেশে দিনরাত ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে।

বহু সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করছে। ধর্ম প্রচার কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামা'তের মাধ্যমে বর্তমান আমরা বিশ্ববিজয়ের সূচনা দেখছি। আজ এক খলীফার নির্দেশে একযুগে সারা বিশ্বজুড়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করছে।

তাই ভাই সকল আপনারাও আসুন, আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়আত করে দু'জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন, আমীন।

মৌ. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান, আহমদনগর, পঞ্চগড়

সংবাদ

খাকদান জামা'তে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ১৪/০২/২০১১ তারিখ বাদ জুমুআ সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোতাহার মৃধা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌ. আব্দুর রহমান, মোয়াল্লেম। নযম পরিবেশন করেন ইমরান আহমদ। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। উক্ত জলসায় রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জালাল আহমদ মাষ্টার, মৌ. আব্দুর রহমান এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। উক্ত জলসায় ৩৭ জন ভ্রাতা/ভগ্নী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

কামাল আকন

তাহেরাবাদ জামা'তে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ১১/০৩/২০১১ তাহেরাবাদ মসজিদে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা পালন করা হয় স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব এর সভাপতিত্বে। উক্ত জলসায় ৬ জন বক্তা হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। দোয়া এবং তবারক বিতরণের মাধ্যমে উক্ত জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। এতে মোট ৪০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ ইউনুস আলী

ডোহান্ডা জামা'তে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ০৪/০৩/২০১১ বাদ আসর হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ডোহান্ডার উদ্যোগে পালিত হয় সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা। জনাব মোকসেদ আলী সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। ব্যক্তিগত জীবনে কুরআন সুন্নাহ্ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে মানবজাতির মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত জলসায় বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল কুদ্দুস এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম, পরিশেষে সভাপতি সাহেব হুযূর (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও তাঁর জামা'তের পরিচিতি, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি তুলে ধরেন এবং তিনি তার বক্তব্যে এলাকাবাসীকে আহমদীয়াত গ্রহণের আহ্বান জানান। পরে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৯০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

হাকিম উদ্দিন শাহ্

ঘাটুরা লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২৮/০২/১১ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন মোহতরমা নার্গিস জাহান লাভলী, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরা। কুরআন তেলাওয়াত করেন ঝুমারা জান্নাত, নযম পাঠ করেন ইসরাত জাহান ইভা, জেবিন আক্তার, মীম ও রাহিলা রহমত পুতুল। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেন মালিহা মুছা, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর অসাধারণ গুণাবলী তুলে ধরেন কাজল রেখা এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বিভিন্ন কর্মকান্ডের আরো কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেন মোবাশ্বেরা সেলিম। নযম পাঠ করেন শাহিনা বেগম। সভাপতি সাহেবার সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৯০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

মালিহা মুছা

খুলনায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার উদ্যোগে গত ০৪-০৩-২০১১ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের মোহতরম আমীর জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব-এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান এবং নযম পাঠ করে শুনান জনাব মাহমুদ আহমদ পল্লব। অত:পর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর পূর্ণতা এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহামন, ওয়াকফে জিন্দেগী এবং মৌ. মাহমুদ আহমদ শরীফ। সবশেষে সভাপতি সাহেব মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর খিলাফতকালিন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দিকনির্দেশনার কথা স্মরণ করিয়ে সে মোতাবেক নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনায় সর্বমোট ৫২ জন্য উপস্থিত ছিলেন।

জি,এম, মুশফিকুর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা ইশরাত তাজিন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফারহানা খন্দকার। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা। হাদীস পাঠ করে শোনান সৈয়দা মাহমুদা এবং মলফুজাত পাঠ করেন শামীম আরা। 'পারিবারিক তরবিয়তের ব্যাপারে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নসিহত' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আমাতুর রশিদ। এরপর নাসেরাত দল নযম গেয়ে শোনান। 'হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দাবীর প্রেক্ষাপট'- সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন উজমা চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রীর সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৩০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

সেলিনা তবশীর রুবী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ হবিগঞ্জ জামালপুর-এর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ হবিগঞ্জ জামালপুর-এর উদ্যোগে গত ০১-০৩-২০১১ইং রোজ মঙ্গলবার বাদ আসর মুসলেহ্ মাওউদ দিবস সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট ফয়জুন্নাহার চৌধুরী (মিনু)-এর সভানেত্রীত্বে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আমাতুন নূর চৌধুরী (মুন্নি), বাংলা নযম পাঠ করেন সোনিয়া আক্তার। অত:পর বক্তৃতা পর্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্যাগণ বক্তব্য রাখেন। সভানেত্রীর দোয়ার মাধ্যমে বক্তৃতার পর্ব শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫ জন লাজনা এবং ৫ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আমাতুন নূর চৌধুরী (মুন্নী)

কোর্ট পাড়া মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৫/০২/২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কোর্ট পাড়া মসজিদে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে দিবসের প্রেক্ষাপট নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন পর্যায়ক্রমে মওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম ও জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব বোখারুল ইসলাম বুখারী। উক্ত দিবসে ২৩ জন আহমদী ৩ জন নওমোবাঈন ও ৬ জন জেরে তবলীগসহ মোট ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ শহীদ উদ্দিন (নিপু)

খুলনা মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রথম তরবিয়তী প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

গত ১১-০২-২০১১ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী বায়তুর রহমান মসজিদে প্রথম তরবিয়তী প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন দীনা নাসরীন, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন আছিয়া জামান নোভা। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা এবং নযম পেশ করেন জহুরা তাজনীন। এই অনুষ্ঠানের তরবিয়তী বিষয় ছিল সন্দেহ কুধারনা থেকে ছিদ্রান্বেষণ এবং ছিদ্রান্বেষণ থেকে গীবত জন্ম নেয়। এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ২০০৪ সালের ৩১ আগষ্ট যে খুতবা দেন সে খোতবার আলোকে সুলতানা ফাতিমা তারিক বিস্তারিত্ আলোচনা করেন এবং কুরআন পাঠের গুরুত্ব, সন্তানের তরবিয়ত ও পর্দার উপর বিশেষভাবে আলোচনা করেন সভানেত্রী সাহেবা। উক্ত সভায় ১৯ জন লাজনা ও নাসেরাত বোন উপস্থিত ছিলেন। এরপর দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রোকসানা মঞ্জুর

তেবাড়ীয়ায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৫ ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেবাড়ীয়ার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস অত্যন্ত শান ও শওকতের সাথে পালিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহসীন রেজা সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কুরআন তেলাওয়াত করেন মাহমুদ আহমদ পান্থ। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর লেখা উর্দু নযম পরিবেশন করেন রিফাত আহমদ শিশির।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বাল্য জীবন, ঐতিহাসিক ২০ ফেব্রুয়ারীর গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব আলহাজ্জ রেজাউল করীম। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন জনাব হামযা আমীর আলী এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. শাহ্ আলম খান।

সভাপতি সাহেবের দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মোট ৭০ জন সদস্য/সদস্যা।

শাহ আলম খান

১৩তম বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন-২০১১ইং অনুষ্ঠিত

গত ০৭-০১-২০১১ হতে ১০-০১-২০১১ পর্যন্ত রাজশাহী ১ অঞ্চলের ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগরে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, মোহতরম হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর তিনি দোয়া পরিচালনা করেন ও উদ্বোধনী ভাষণ প্রধান করেন। এছাড়া সভায় আরও বক্তব্য রাখেন মৌ. আব্দুস সালাম, মোয়াল্লেম আহমদনগর, জনাব তাহের যুগল, প্রেসিডেন্ট আহমদনগর, জনাব আলহাজ্জ তাহের আহমদ, সহকারী সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। উদ্বোধনী অধিবেশনের পরে যথারীতি ক্লাস শুরু হয়। উক্ত ক্লাসে শিক্ষক হিসেবে ছিলেন মওলানা রইস আহমদ, মৌ. আব্দুস সালাম, মৌ. মাহমুদুল হাসান মিনহাজ ও মৌ. হুমায়ুন কবির। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে ও ক্লাসের ফাকে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেব, ওয়াকফে নও ছাত্র-ছাত্রীদের ও পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। একদিন বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযেরও ব্যবস্থা ছিল। উক্ত ক্লাসে অত্র অঞ্চলের ৫৪ জন ওয়াকফে নও মুজাহেদীন অংশগ্রহণ করেন।

ক্লাস শেষে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেওয়া ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১০ তারিখ বাদ যোহর সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফেনও। কুরআন

তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তব্য রাখেন, যথাক্রমে মৌ. মাহমুদুল হাসান মিনহাজ, প্রেসিডেন্ট, আহমদনগর, মওলানা রইস আহমদ এবং সহকারী সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। অত:পর সভাপতি সাহেব ভাষন দান করেন। ভাষণে তিনি ওয়াকফে নও, মুজাহিদীন ও পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত প্রদান করেন। সভাপতি সাহেবের ভাষণের পর পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকফে নও, তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আলহাজ্জ তাহের আহমদ

ডোহান্ডা জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৫/০২/২০১১ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ডোহান্ডার উদ্যোগে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আফতাব আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ডোহান্ডা। শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফারান আহমদ। নযম পাঠ করেন সালেহ আহমদ। অত:পর মুসলেহ্ মাওউদ দিবস কি এবং কেন উক্ত দিবসের গুরুত্বের আলোকে আমাদের ব্যক্তি জীবনে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব আব্দুল কুদ্দুস এবং মৌ. এম, এ, আনসারী, স্থানীয় মোয়াল্লেম এবং নওমোবাঈন ভ্রাতা মোকসেদ আলী। পরিশেষ সভাপতির ঘোষণা অনুসারে স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেবের ইস্তেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

হাকিম উদ্দিন শাহ

জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ০৮-০৩-২০১১ তারিখে রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জামালপুরের স্থানীয় মসজিদে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। শুরুতে দোয়া পরিচালনা করেন মৌ. রফিকুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। নযম পাঠ করেন জনি আহমদ চৌধুরী। বক্তৃতা প্রদান করেন ডা: রফিক আহমদ চৌধুরী, মৌ. রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্যরা। বক্তৃতা শেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ করা হয়। উক্ত দিবসে ২৪ জন ভ্রাতা/ভগ্নী উপস্থিত ছিলেন।

কবীর আহমদ চৌধুরী

বগুড়া জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ০৪/০৩/২০১১ বাদ জুমুআ মুসলেহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব খন্দকার আজমল হক। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, মতিউর রহমান, নযম পাঠ করেন হাসিবুল হক। তারপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন প্রফেসর রাজিবউদ্দিন আহমদ, বায়তুল মাল সম্পর্কে আলোচনা করেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ফিরোজ আহমদ, মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। তারপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী '২০১১ বৃহস্পতিবার, স্থানীয় মসজিদ 'বায়তুল ওয়াহেদ'-এ মুসলেহ্ মাওউদ দিবস অত্যন্ত শান ও শওকতের সাথে উদযাপন করা হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা প্রেসিডেন্ট শামীমা আক্তার লিলি। নাসিমা আসাদ এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাংলা নযম পরিবেশ করেন আরজিনা আক্তার রিতু। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে শিরিন খানম, হেলেন বেগম, জুবেদা বেগম ও মুফাত্তিস মাকসুদা ফারুক। আলোচনার মধ্যবর্তী সময়ে উর্দু নযম পরিবেশন করেন মহিনা কবীর ও তানিয়া। প্রেসিডেন্ট সাহেবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপনের পর দলীয় ক্বাসিদা পরিবেশেন করেন জেরিন রায়হান মৌমিতা ও তার দল। সবশেষে মুফাত্তিস সাহেবার দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে লাজনা ও নাসেরাত মিলে ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

শামীমা আক্তার লিলি

তারুয়া জামাতে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২০-০২-২০১১ ফেব্রুয়ারী বাদ মাগরীব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তারুয়ার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সামসু মিয়া। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন শফিউল আযম (শশি), নযম পাঠ করেন ইশান আহমদ ও ছাব্বির আহমদ। মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব ফজলুল হক ভূইয়া, খলিল আহমদ, জাহির আহমদ মিয়াজী এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. খলিলুর রহমান। সবশেষে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শফিউল আজম (শশি)

নরায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

নরায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ২৫-০২-২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মুসলেহ্ মাওউদ দিবস সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট দিলরুবা বেগম-এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও তরজমাসহ পাঠ করেন হামিদা খায়ের, উর্দু ও বাংলা নযম আবৃত্তি করেন সুরাইয়া নাসের তুলি ও সুলতানা নাসিরা। অত:পর বক্তৃতা পর্বে মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন শিমুল আহমদ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবন চরিত ও কৃতিত্ব এ সম্পর্কে আলোচনা করেন সুফিয়া বেগম। মুসলেহ্ মাওউদ দিবস সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে

বক্তব্য রাখেন, মাসুদা পারভেজ।

সভানেত্রীর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে ৩০ জন লাজনা ও ২০ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে উপস্থিত সবাইকে বিশেষ আপ্যায়নের মাধ্যমে আপ্যায়িত করা হয়।

উম্মে কুলসুম চায়না

আশকোনা হালকায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৫/০২/২০১১ তারিখে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার আশকোনা হালকার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে বক্তৃতা প্রদান করেন স্থানীয় হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব সাবের আহমদ, মওলানা জাফর আহমদ। যয়ীম, মজলিস আনসারুল্লাহ্ আশকোনা হালকা। নায়েব কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকা। যয়ীম, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আশকোনা হালকা। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১১০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খাকদানে দিনব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৫/০২/২০১১ তারিখে দিনব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা লাজনা ইমাইল্লাহ্ খাকদানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে সভাপতিত্ব করেন জনাবা হাসিনারা জালাল, প্রেসিডেন্ট। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লায়লা রহমান, নযম পরিবেশন করেন নারগিছ বেগম। উক্ত ক্লাসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোতাহার মৃধা, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। শিক্ষক ও বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মৌ. আব্দুর রহমান, মোয়াল্লেম এবং মৌ. ইদ্রিস আহ্‌মদ, মোয়াল্লেম। উক্ত ক্লাসে মোট ২৬ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

শারমিন রহমান

কৃতী ছাত্রী

নুসরাত জাহান রাফা (সুস্মিতা), আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কুষ্টিয়ার একজন ওয়াকফে নও, নাসেরাত। সে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী (পি, এস, সি) পরীক্ষায় জি, পি, এ-৫-এর পাশাপাশি টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার পিতা মোহাম্মদ বোখারুল ইসলাম বোখারী এবং মাতা ফরিদা বোখারী মেয়ের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থী।

মোহাম্মদ খুরশিদ আলম

সন্তান লাভ

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ করুণা ও দয়ায় আমরা গত ১৬ মার্চ ২০১১ সকাল ১১ ঘটিকায় এক কন্যা সন্তান লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। নবজাতক ওয়াকফে নও-এর মহান তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তার নাম রেখেছেন, আফিয়া আহমদ। আমরা আমাদের মেয়ের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সে যেন ইসলামের সেবায় নিবেদিত প্রাণ সেবিকা হয় এজন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীর কাছে দোয়া কামনা করছি।

দোয়াপ্রার্থী
মাহমুদ আহমদ সুমন ও
ফারহানা মাহমুদ তন্বী

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। প্রতি সংখ্যার পাঠক কলামে লিখার জন্য একটি নির্দ্ধারিত বিষয় উল্লেখ থাকবে।

এবারের পাঠক কলামের বিষয় **'প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি এসব কিসের আলামত?'**। আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ এপ্রিল, ২০১১ এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)

৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

তারিখ	এপ্রিল ২০১১ MTA এর বাংলা অনুষ্ঠানসূচী (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টা)
URDV-460 ০২ এপ্রিল, শনিবার	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ৮৭তম সালানা জলসার উপর একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এবং ৮৭তম সালানা জলসায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ব্রাদার আব্দুল আলীমের বক্তৃতা। (English & বাংলা) (পুনঃ)।
URDV-461 ০৪ এপ্রিল , সোমবার	"ভারসাম্যপূর্ণ সুখী ইসলামী দম্পত্য ও পারিবারিক জীবন " ৮৭তম সালানা জলসায় মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলূন সাহেবের বক্তৃতা। (Urdu & বাংলা) (পুনঃপ্রচার)
URDV-463 ০৫ এপ্রিল, মঙ্গলবার	"ঐশী জামা'তের বিরোধিতা একটি চিরন্তন নিয়ম" - এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী (৮৭তম সালানা জলসা) এবং ৮৭তম সালানা জলসায় সিরীয় প্রতিনিধি ব্রাদার মুনির ইদিলবীর বক্তৃতা। [উর্দু ও বাংলা] [আরবী ও বাংলা] (পুনঃ)
URDV-464 ০৬ এপ্রিল, বুধবার	৮৭তম সালানা জলসায় যোগদানকারী দুজন বিদেশী মেহমানের সাক্ষাৎকার - ব্রাদার আব্দুল আলীম (যুক্তরাষ্ট্র) ও ব্রাদার মুনির ইদিলবী (সিরিয়া), সঞ্চালক - আহমদ তবশীর চৌধুরী। [English & বাংলা] (পুনঃপ্রচার)
URDV 465 ০৯ এপ্রিল, শনিবার	৮৭তম সালানা জলসায় যোগদানকারী তিনজন প্রবাসীর সাক্ষাৎকার - জনাব আকরাম মোহাম্মদ (ইটালী), জনাব আতেক হাদী ও আব্দুল খালেক বাঙ্গালী (যুক্তরাজ্য), সঞ্চালক - নুরুল ইসলাম মিঠু। (পুনঃপ্রচার)
URDV-460 ১১ এপ্রিল, সোমবার	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ৮৭তম সালানা জলসার উপর একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এবং ৮৭তম সালানা জলসায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ব্রাদার আব্দুল আলীমের বক্তৃতা। (English & বাংলা) (পুনঃপ্রচার)
URDV-461 ১২ এপ্রিল, মঙ্গলবার	"ভারসাম্যপূর্ণ সুখী ইসলামী দম্পত্য ও পারিবারিক জীবন " ৮৭তম সালানা জলসায় মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলূন সাহেবের বক্তৃতা। (Urdu & বাংলা) (পুনঃপ্রচার)
URDV-463 ১৩ এপ্রিল, বুধবার	"ঐশী জামা'তের বিরোধিতা একটি চিরন্তন নিয়ম" - এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী (৮৭তম সালানা জলসা) এবং ৮৭তম সালানা জলসায় সিরীয় প্রতিনিধি ব্রাদার মুনির ইদিলবীর বক্তৃতা। [উর্দু ও বাংলা] [আরবী ও বাংলা] (পুনঃ)
URDV-465 ১৬ এপ্রিল, শনিবার	৮৭তম সালানা জলসায় যোগদানকারী তিনজন প্রবাসীর সাক্ষাৎকার - জনাব আকরাম মোহাম্মদ (ইটালী), জনাব আতেক হাদী ও আব্দুল খালেক বাঙ্গালী (যুক্তরাজ্য), সঞ্চালক - নুরুল ইসলাম মিঠু। (পুনঃপ্রচার)
URDV-458 ১৮ এপ্রিল সোমবার	আলোচনাঃ "সীরাতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) - মাওলানা জাফর আহমদ, বক্তৃতাঃ "ওয়াক্‌ফে নও'দের পেশা নির্বাচন" - আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী (পুনঃপ্রচার)
URDV-420 ১৯ এপ্রিল, মঙ্গলবার	প্রজন্ম ভাবনা-১ : আহমদী প্রজন্মের অংশগ্রহণে একটি অনুষ্ঠান, এবারের বিষয়- "দেশ ও সমাজ" বিজ্ঞ প্যানেল- জনাব মোবাশ্বের উর রহমান, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, লে. কে. আমজাদ খান চৌধুরী (অব.) সঞ্চালক: অধ্যাপক নাজমুল হক। (পুনঃপ্রচার)
URDV-462 ২০ এপ্রিল, বুধবার	"হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর সত্যতা ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব" হাফেজ মাও. আবু তাহের । "হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সূচিত আধ্যাত্মিক বিপ্লব " -মাওলানা সালেহ আহমদ (৮৭তম সালানা জলসা) (নতুন)
২১-২৪ এপ্রি (বৃহ-রবি)	"সত্যের সন্ধানে", ৯ম পর্ব ৪ দিন, (পুনঃপ্রচার) + শুক্রবার - হুযুরের (আইঃ) জুমুআর খুতবা।
URDV-466 ২৫ এপ্রিল, সোমবার	"আহমদীয়াতের বিরোধিতা" - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ "ওয়াক্‌ফে নও" শিশুদের নিয়ে বৈঠক - মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমিন (নতুন)
URDV-467 ২৬ এপ্রিল, মঙ্গলবার	"বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আহমদী তরুনদের কর্তব্য" - প্রফেসর ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তর - মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলূন। (নতুন)
URDV-468 ২৭ এপ্রিল, বুধবার	"বিয়ে-শাদী ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সামাজিক কদাচার পরিহারে আমাদের কর্তব্য " - কাওসার আলী মোল্লা আলোচনাঃ "সীরাতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)" - মাওলানা জাফর আহমদ (নতুন)
২৮, ২৯ , ৩০ এপ্রিল এবং ১ মে, ২০১১	"সত্যের সন্ধানে", ১০ম পর্ব, ৪ দিন (নতুন) + শুক্রবার হুযুরের (আইঃ) জুমুআর খুতবা

বিঃদ্রঃ প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টাঃ হুযুরের (আইঃ) জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার ও তার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান।
প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টাঃ হুযুরের (আইঃ) জুমুআর খুতবার পুনঃপ্রচার এবং
প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টাঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান। প্রয়োজনে অনুষ্ঠান সূচীর পরিবর্তন হতে পারে।

হুযুরের (আইঃ) জুমুআর খুতবার সরাসরি বাংলা সম্প্রচার সহ MTA দেখুন ইন্টারনেটেঃ

http://www.mta.tv

অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শ পাঠানঃ আহমদ তবশির চৌধুরী , ইনচার্জ, এম টি এ, বাংলাদেশ স্টুডিও।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। Email: atabshir@hotmail.com